১

ওদের দুটিতে অত্যন্ত সদ্ভাব। মৃন্ময় এবং মঞ্জুষা। মৃন্ময়ের বয়স নয়, মঞ্জুষার ছয়।

মৃন্ময়ের পিতা প্রতুল ভট্টাচার্য্য গভর্ণমেণ্ট আপিসের অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী। শ-খানেক করিয়া পেন্সন পাইতেছেন। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছেন। মৃন্ময় তাঁর সর্ব্বকনিষ্ঠ।

মঞ্জুষার পিতা জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের মস্ত জমিদার। পদ্মার প্রচণ্ড ভাঙনে তাঁর বহু ক্ষতি হইলেও যাহা আছে তাহা প্রচুর। লোক হিসাবে তিনি ভালই, তবে একটু খেয়ালী---এই যা। ওঁরা তিন পুরুষ জমিদার। যদিচ জীবানন্দ একটু একালঘেঁষা তথাপি বাপপিতামহের আমলের চালচলন অনেক কিছুই বজায় রাখিয়াছেন। অনাবশ্যক গোঁড়ামি কোথাও নাই; না কথায় না কাজে। পুত্রকে তিনি বিলাত পাঠাইয়াছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। দুটি মেয়েকে রীতিমত শিক্ষিতা করিয়া তিনি বিবাহ দিয়াছেন। কনিষ্ঠা মঞ্জুষাকেও তিনি এখন হইতেই উৎসাহ দিতেছেন।

প্রতুল এবং জীবানন্দের মধ্যে এক সময় প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একই গ্রামে পাশাপাশি ওঁদের বাড়ী। একের সামান্য টিনের দোচালা, অপরের প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী। একের টাকার অঙ্ক গুনিয়া শেষ করা যায় না, অপরে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করেন। অথচ উভয়ে উভয়ের বন্ধু। পরিহাস নয়—সত্য। দীর্ঘ আট বৎসর একসঙ্গে

একই স্কুলে থাকিয়া প্রবেশিকাদ্বার অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁদের এই আট বছরের অনেক ইতিহাসই জমা হইয়া আছে, কিন্তু অতীত দিনের সে সব পুরাতন কথা লইয়া আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই।

পরীক্ষান্তে জীবানন্দের পিতা তাঁহাকে জমিদারীতে টানিয়া লইলেন। প্রতুল বাহির হইয়া পড়িলেন অন্নচিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের আশায়। এই সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি। কিন্তু মন হইতে কেহ কাহাকেও মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

ইহারই মাসকয়েক পরে জীবানন্দকে বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু তাঁর পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও প্রতুল তাঁর নূতন কর্ম্ম-স্থল হইতে এক পা নড়িতে পারিলেন না। পত্রে জানাইলেন, তোমার বিবাহে আমার উপস্থিত থাকা উচিত এ কথা আমি বুঝি, কিন্তু পরের চাকরী করিয়া যাদের দিন চালাইতে হয় তাদের দুঃখ তোমরা বুঝিবে না।

উত্তরে জীবানন্দ জানাইয়াছিলেন, অমন চাকরী তোমার না করিলেও চলিবে। কর্ত্তৃপক্ষকে তোমার জানাইয়া দেওয়া উচিত যে চাকরী করিতে গিয়াছ বলিয়াই মাথা বিক্রয় করো নাই।

প্রত্যুত্তরে প্রতুল পুনরায় লিখিলেন, কথাটা তোমার মত করিয়া বলিতে পারিলে গর্ব্ববোধ করিতাম, কিন্তু অন্নচিন্তার পাপ আমাদের সকল দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। আমার বর্ত্তমান অবস্থা ত তোমার অগোচর নয়।

উত্তরে জীবানন্দ একটু গরম হইয়া লিখিলেন, জমিদার বলিয়া আমায় অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু বন্ধুত্বের অপমান করিও না। মাসিক এক শত টাকার ব্যবস্থা আমিও তোমার জন্য করিতে পারিব।

ইহার উত্তরে প্রতুল অত্যন্ত নরম স্বরে লিখিলেন, আমিও তোমার কথা সমর্থন করি এবং বলি যে, আমাদের বন্ধুত্বের মাঝে অর্থের সম্বন্ধ টানিয়া আনিও না। ছুটির জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা। অযথা তুমি আমার উপর রাগ করিও না—এ আমার অনুরোধ।

জীবানন্দ নীরব রহিলেন।

বন্ধুর বিবাহে প্রতুল তাঁহার সাধ্যমত উপহার পাঠাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। জীবানন্দ পুনরায় তাঁহাকে চিঠি দিয়া উত্ত্যক্ত না করিলেও মনে মনে আহত হইলেন। এবং এই ব্যবহারের পাল্টা জবাব দিলেন প্রতুলের বিবাহে। গায়ে পড়িয়া তিনি এমন মাতামাতি সুরু করিলেন যে, প্রতুলকে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দিতে হইল।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, তোমার মত দূরে থাকতে পারি নি বলে তোমার খুশী হওয়া উচিত ছিল। নইলে নষ্ট করবার মত সময় আমারও নেই।

অতীতের এমনি কত ঘটনাই আজও চোখের সম্মুখে দেখা দেয়। এই ত সেদিনের কথা অথচ আজ তাঁরা প্রৌঢ়।

বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তার পরেই দেখা দিল কর্ম্মজীবনের প্রচণ্ড সংগ্রাম। আজ এখানে কাল ওখানে। উপরন্তু কাঁধে স্ত্রী এবং খানকয়েক ছেলেমেয়ে। জীবনের চূড়ান্ত বৈচিত্র্য। এমনি করিয়াই জীবনের ত্রিশটি বছর কাটাইয়া দিয়া বর্ত্তমানে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এখানে আসিয়া প্রতুলের সর্ব্বপ্রথমেই জীবানন্দকে মনে পড়িলেও ভরসা করিয়া তিনি তাঁর সহিত দেখা করিতে যান নাই। জমিদার-মানুষ। তা ছাড়া প্রবাস-বাস কালে বন্ধুর কোন খবরাখবরই তিনি লন নাই। সংসারের সুখদুঃখ এবং ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া এদিকে চোখ ফিরাইবার অবকাশ তিনি পান নাই, কিন্তু আজিকার এই

নিঃসঙ্গতা বার বার বন্ধুকে মনে করাইয়া দিতেছে। এমনি যখন তার মনের অবস্থা তখন জীবানন্দের সাদর আহ্বান আসিয়া পৌছিল প্রতুল বাঁচিয়া গেলেন।

বৈকালে পুত্র মৃন্ময়ের হাত ধরিয়া তিনি জমিদার-বাড়ীর দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সে চেহারা বর্তমানে নাই। আধুনিক রুচির স্পর্শে তার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিতে বেগ পাইতে হইল না। যদিচ দুই জন পশ্চিমা দ্বাররক্ষী টহল দিয়া ফিরিতেছিল।

জীবানন্দ বাহির মহলেই ছিলেন। আর ছিল তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মঞ্জুষা। একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে একখানি ছবির বই দেখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে নানাপ্রকার অদ্ভুদ প্রশ্ন করিয়া পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সহসা এক আগন্তুকের সহিত তারই বয়সী একটি ছেলেকে আসিতে দেখিয়া সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল. কারা এসেছে দেখ না বাবা—

জীবানন্দ সোজা হইয়া বসিলেন। কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমার জেঠাবাবু, প্রণাম কর। প্রতুলকে কহিলেন. বোস'।

মঞ্জুষা পিতার কোল ঘেঁষিয়া সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের প্রতি মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল। মৃন্ময় একবার পিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া সহসা জীবানন্দের পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। জীবানন্দ তাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। মঞ্জুষা মুখ ভার করিয়া এই অপরিচিত ছেলেটির প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। জীবানন্দ কন্যার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া মৃদুহাস্যে কহিলেন, ওর সঙ্গে খেলা করোগে মঞ্জু।

মঞ্জুষা মৃন্ময়ের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আসিল এবং পুনরায় পিছাইয়া গিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল. ও আমার কি হয় বাবা?

জীবানন্দ মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া শিশুর মত চঞ্চল কণ্ঠে কহিলেন, তোমার বন্ধু মা-মণি।

পরক্ষণেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া প্রতুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, বুঝলে প্রতুল···তোমার ছেলে এবং আমার মেয়ের এর চেয়ে বড় বন্ধন আর কি হতে পারে ভাই!

প্রতুল নীরব রহিলেন, তাঁর চোখের সম্মুখে তখন তাঁদের বাল্যস্মৃতি ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। সেদিনের সেই জীবানন্দ আজও ঠিক তেমনিটিই আছে, তেমনি ছেলে-মানুষ—তেমনি প্রগল্‌ভ।

জীবানন্দ পুনরায় কহিলেন, ওকে তোমার ছবির বই দেখাবে না মঞ্জু?

মঞ্জুষা অকস্মাৎ খুশী হইয়া উঠিল। বাবা কিছু বোঝেন না। তার ছবির বই দেখিয়া শুধু হুঁ হাঁ করেন। এ ত আর তার বাবার মত অত বড় নয়···ছেলেমানুষ। তার চেয়ে মোটে একটুখানি ত বড়।

মঞ্জুষা মৃন্ময়ের সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, এই···তোমার নাম কি বলো না?

আমার নাম? মৃন্ময় বলে, আমার নাম মৃন্ময়। বাবা আমাকে মিনু বলে ডাকেন।

মঞ্জুষা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে? আমার ছবির বই, ময়ূর, খরগোস, বিলিতী ইঁদুর আর মোনিয়া পাখী দেখবে?

মৃন্ময় সোৎসাহে সম্মতি জানাইল।

মঞ্জুষা কহিল, সব দেখবে। এক্ষুনি?

মৃন্ময় পুনরায় সম্মতি জানাইল।

খুশীতে মঞ্জুষার দুই চোখ নৃত্য করিতে লাগিল। এক মুহূর্ত তার বিলম্ব সহিতেছিল না।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, তোমার অনেক পাখী আর খরগোস আছে? সাদা সাদা খরগোস আর লাল লাল মোনিয়া পাখী?

মঞ্জুষা হাত পা নাড়িয়া এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কহিল, অ-নে-ক আছে।

জীবানন্দ এবং প্রতুল উভয়েই হাসিলেন, কথা কহিলেন না।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার নেই।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি নেবে? আমার অনেক আছে। দুটো, পাঁচটা, দশটা। তুমি আগে চলোই না মার কাছে—বলিয়া সে সাগ্রহে মৃন্ময়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। দু'পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় হাত-মুখ নাড়িয়া কহিল, আর যদি দুষ্টুমি না করো তবে একটা মস্ত বড় ডলও তোমায় দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, তুমি ছবির বই ভালবাস?

মৃন্ময় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, খু-উব।

তারও একটা দিয়ে দেব। মঞ্জুষা বলে, আগে তুমি চলো আমার খরগোস আর মোনিয়া পাখী দেখতে। এক একটি মুহূর্ত্তের বিলম্ব মঞ্জুকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল।

মৃন্ময় পিতার মুখের প্রতি চাইতেই তিনি হাসিয়া সম্মতি দিলেন। দু'জনে খুশীমনে প্রস্থান করিল।

জীবানন্দ একটি হাই তুলিয়া কহিলেন, তবু ভাল যে তোমার দেখা পাওয়া গেল প্রতুল। ডেকে না পাঠালে বোধ হয় আসতে না?

প্রতুল হাসিলেন।

জীবানন্দ বলিয়া চলিলেন, আজ আমরা প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার মৃন্ময় আর আমার মঞ্জুকে দেখে বহু পূর্ব্বের কথা আমার বার বার মনে

পড়ছিল। এমনি করেই হঠাৎ একদিন আমাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব হয়েছিল। ছেলেবেলায় ছিলাম বন্ধু, তারপর বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের পার্থক্যটাই হ'ল সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তুমি গেলে সরে। সেই থেকে আমি নিজেকে নিজে বহুদিন জিজ্ঞাসা করেছি, এই যে প্রতুল গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে এ কেমন করে সম্ভব হ'ল। এর অন্য কোন কারণ থাকতে পারে কিনা ?

প্রতুল পুনরায় হাসিলেন। কিন্তু জীবানন্দ থামিতে পারিলেন না। বলিয়া চলিলেন, তুমি হেস না প্রতুল। এদের এই সখ্যের সূচনা দেখে আমার আজ নূতন করে আমাদের অতীতকে মনে পড়ছে। সামান্য কারণে মারামারি, কথা বন্ধ। লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ীর পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ান। একের হয়তো মন গললো···অপরে দাঁড়াতাম মুখ ঘুরিয়ে। ঘটনা হিসেবে এর কতটুকু মূল্য তার চুলচেরা হিসেব আজ করতে বসো না। কিন্তু বলতে পার প্রতুল, এমনি প্রাণবন্ত বস্তুর পরিবর্ত্তে আজ যা পড়ে আছে অনুভূতির দিক থেকে তা কতটুকু।

প্রতুল মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, তুমি বরাবরই একটু ভাবপ্রবণ।

জীবানন্দ অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন, হয়তো তোমার কথাই ঠিক নইলে আজ পঁচিশ-তিরিশ বছর পরে দেশে এসেছ অথচ ডেকে না পাঠাতে একবার দেখা দেবার ফুরসত পর্য্যন্ত তোমার হয়নি।

প্রতুল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, পরিবর্ত্তনটা হ'ল জীবনে একটি স্বাভাবিক পরিণতি। আমাকে অনুযোগ দিতে পার. কিন্তু দোষ দেওয়া চলে না। তা ছাড়া শুধু একটা দিকই তোমার চোখে পড়েছে। সব কথা তোমার জানবার কথাও নয়—সম্ভবও নয়, কিন্তু তোমাকে ঠিক আগের মত পেয়ে ‍বুক আমার ভরে উঠেছে। তুমি এক তিল বদলাও নি।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, বদলেছি বৈকি! নইলে তোমাদের গোঁড়া জীবানন্দ কখনো তার ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠাতে পারত না। মেয়েদের সম্বন্ধেও এতটা উদার হয়ে ওঠা সম্ভব হ'ত না।

প্রতুল কহিলেন, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছ?

না।···জীবানন্দ কহিলেন. তার দরকার মনে করি নি। তাকে পুরোপুরি মানুষ করতেই আমি চাই। প্রলোভনকে যদি সে জয় করতে না পারে সে তার দুর্ভাগ্য।

প্রতুল কহিলেন, কাজটা ভাল করোনি।

জীবানন্দ কহিলেন. তোমার মতে দানে ভুল্ করেছি। কিন্তু সকলেই ত এক পদ্ধতিতে হিসেব করে না ভাই। যদি ভুল করে থাকি নিজের কর্ম্মফল বলে মেনে নেব। সে বরং আমার সহ্য হবে. কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি আর একটি মেয়েকে ডেকে আনতে রাজী নই। তাই ও কাজ করতে পারি নি।

জীবানন্দ মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু এ সব আলোচনার ঢের সময় পাওয়া যাবে। চল অন্দর মহলে একবার দেখা দিয়ে নদীর ধার থেকে একটু ঘুরে আসি।

২

প্রথম সাক্ষাতের সঙ্কোচ কাটিয়া গেছে। জীবানন্দ এবং প্রতুল প্রত্যহই একবার করিয়া মিলিত হইতেছেন। তাঁরা যেন পুনরায় তাঁদের অতীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মৃন্ময় তার পিতার প্রায় রোজকার সঙ্গী। মঞ্জুষার আনন্দের সীমা নাই। মৃন্ময়কে তার খুব ভাল লাগে। বয়সে সে মঞ্জুষার চেয়ে অল্প বড় হইলেও এরই মধ্যে অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। কত রাজ্যের গল্প যে ও জানে। শুধু পুতুলখেলাতেই যা ওর আপত্তি।

এক দিন মৃন্ময় না আসিলে মঞ্জুষা ব্যস্ত হইয়া উঠে। তার বাবার কাছে বার বার প্রশ্ন করে। তেওয়ারীকে পাগল করিয়া তোলে তাকে মৃন্ময়দের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য। পুতুলখেলা মঞ্জুষা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে। ইদানীং তার গল্প শুনিবার আগ্রহই বেশী। বাবা অথবা তেওয়ারীর গল্প তার ভাল লাগে না।

তেওয়ারীকে উঠিতে হয়। না উঠিয়া উপায় নাই। এখনি হয় তো অনর্থ বাধাইবে। মৃন্ময়দের বাড়ী আসিয়া মঞ্জুষা রাগত কণ্ঠে বলে, তুমি আজ যাওনি কেন?

মৃন্ময় বিজ্ঞের ন্যায় হাসিয়া কহিল, কেমন করে রোজ রোজ যাই বল। আমি যে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। মূর্খ হয়ে থাকলে তা আর চলবে না আমার। বাবার কাছে আবার রোজ পড়া দিতে হয় যে।

মঞ্জুষা রাগ করে। মৃন্ময় গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তুমি ত পড়তে জান না, তাই রাগ করছ।

মঞ্জুষার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলে, বা রে রোজ আমাকে মাষ্টার মশাই পড়ান যে। আমি ইংরেজী বইও পড়তে পারি। হাসিখুশী, প্রথম ভাগ ত কবে শেষ করে ফেলেছি। তা জান তুমি?

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া মৃন্ময় কহিল, ওতো ছোট ছেলেরাও জানে। জান আমার বইগুলো সব ইয়া মোটা মোটা। দাঁড়াওনা এর পরে কত গল্প তোমায় শোনাব।'

মঞ্জুষা কহিল, তোমার কতগুলো বই ?

মৃন্ময় গম্ভীর ভাবে কহিল, আট-দশখানা হবে।

মঞ্জুষা বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। কহিল, ওতে বুঝি খুব ভাল ভাল গল্প আছে ?

মৃন্ময় ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মঞ্জুষার মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

* * * *

দিন চলিয়া যায়। ময়ূর, খরগোস অথবা মোনিয়া পাখী দেখিয়া এখন আর মৃন্ময় তৃপ্ত নয়। পাতালপুরীর রাজকন্যার গল্পও তাকে এখন আনন্দ দেয় না। তার চেয়ে ইতিহাসের গল্প লইয়া মাতিয়া উঠিতে তার আগ্রহ বেশী।

আকবর বাদশা শুভবুদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে মূলধন করিয়া কতবড় বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহম্মদ তোগলক কেন লোকের কাছে এত অপ্রিয় হইয়াছিলেন···জয়চন্দ্রের পর্ব্বতপ্রমাণ ভ্রান্তিই পৃথ্বীরাজ এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বজাতির ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিয়াছিল··· আকবরের সাম্রাজ্যের পাকা বুনিয়াদ আওরংজীবের গোঁড়া ধর্ম্মবুদ্ধির বেদীমূলে কেমন করিয়া ধ্বংসের সূচনা করিয়াছিল—এই সব তথ্য লইয়া আলোচনা করিতে আজকাল মৃন্ময় আনন্দ পায়। গল্পচ্ছলে মৃন্ময় ইদানীং এই সব কাহিনীই মঞ্জুষাকে বলিয়া থাকে। মঞ্জুষা কখন শোনে কখনও শোনে না। ইহার চেয়ে ভূতের গল্প তার ভাল লাগে।

মঞ্জুষাকে দোষ দেওয়া যায় না। খালি অস্ত্রের ঝনঝনানি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লইয়া শক্তিমানের রাজনৈতিক দাবা খেলার মর্ম্মান্তিক কাহিনী। ইহা লইয়া রাজনীতিবিদেরা চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারেন— উৎসাহ দেখাইতে পারেন···কিম্বা কোন গভীর ইঙ্গিত করিতেও পারেন,

কিন্তু মঞ্জুষার মত একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে তার কতটুকু বোঝে। কতখানি তার চিন্তাশক্তি! বরং ইহার বীভৎসতায় তার চোখে জল দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মৃন্ময়ের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। ইহা লইয়া তার গল্প করিবার অনেক হেতু আছে। সে ইতিহাসের রাজারাজড়াদের সহিত পরিচিত হইয়াছে—তাদের নাড়ীনক্ষত্র যে ওর জিহ্বাগ্রে এ কথাটা মঞ্জুষাকে না জানাইতে পারিলে তার স্বস্তি নাই। তা ছাড়া তার বাবা বলেন যে, বইয়ের বিষয় লইয়া গল্প করিলে পড়া সহজে আয়ত্ত হয়।

মঞ্জুষা বলে, তোমার ইতিহাসের গল্প থামাও মিনুদা। ও আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে তোমার নাঙ্কুদার গল্প ঢের ভাল। আচ্ছা মিনুদা তোমার নাঙ্কুদাকে একদিন আমাদের বাড়ী নিয়ে এসো না কেন। বেশ আলাপ ক'রে নেব।

মৃন্ময় মুখ বাঁকাইয়া কহিল, যা দুষ্টু ছেলে নাঙ্কুদা। ক্লাসশুদ্ধ সকলকে মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেয়।

মঞ্জুষা হাসিয়া উঠিল, কহিল তোমাকেও মেরেছে বুঝি?

মৃন্ময় কহিল, না আমাকে কিছু বলে না। আমি ত আর দুষ্টুমি করি না।

মঞ্জুষা কহিল, তা হলে আমিও দুষ্টুমি করবো না। তুমি এক দিন নিয়ে এসো কিন্তু। নাঙ্কু তোমাদের ক্লাসের মনিটার বুঝি?

মৃন্ময় মুখে অস্ফুট শব্দ করিয়া কহিল, হুঁ···

এত কথার পরেও মঞ্জুষাকে মৃন্ময়ের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, সে নাঙ্কুকে একদিন লইয়া আসিবে। প্রতিশ্রুতি পালন করিতেও সে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু জমিদার বাড়ীর নাম শুনিয়াই নাঙ্কু চমকাইয়া উঠিল, কহিল, ওরে বাবা! ঐ খানে ভোজপুরীর চাবুক খেতে! আমার পিঠ অত সস্তা নয়।

মৃন্ময় নান্কুর এই অকারণ অভিযোগে বিস্মিত হইল।

নান্কু হাত নাড়িয়া কহিল, তুই ও ভোজপুরীকে জানিস নে মিনু তাই বলছিস। আমার পিঠের চামড়া প্রায় তুলে নিয়েছিল আর কি! ভাগ্যিস জমিদার বাবু এসে পড়েছিলেন নইলে···নান্কু অতীতের কথা আর একবার স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। কহিল, হাতে চাবুক, কোমরে ভোজালি!

বিস্মিত কণ্ঠে মৃন্ময় কহিল, তোমাকে যদি শুধু শুধুই মারতে এল তবে জমিদার বাবুকে বলে দিলেই পারতে।

নান্কু হি হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, শুধু শুধু নয় রে শুধু শুধু নয়! চুরি করতে গিয়েছিলাম। ফুল আর পেয়ারা।

মৃন্ময়ও হাসিতে যোগ দিল। কহিল, কিন্তু এখন ত আর চুরি করতে যাচ্ছ না যে ভয় পাচ্ছ। তা ছাড়া মঞ্জু ওরা সত্যি খুব ভাল লোক। তুমি না বলে নিতে গেলে কেন? একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনরায় কহিল, আমি মঞ্জুর কাছে তোমার অনেক গল্প করেছি। মঞ্জু তোমায় নিয়ে যেতে বলেছে।

নান্কু কহিল, কিন্তু ওদের ভোজপুরীকে দেখলেই আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। ওখানে আমি কিছুতেই যাচ্ছিনে।

মৃন্ময় নীরব রহিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একদিন নান্কুকে যাইতে হইল— অত্যন্ত ভয় এবং সঙ্কোচের সহিত। বহির্দ্বারে দারোয়ান তার মুখের পানে চাহিতেই নান্কুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বৎসর দুই পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের দেখা একখানি কচি অপরাধী মুখ সে স্মরণে আনিতে পারিল না। নান্কু বাঁচিয়া গেল।

মৃন্ময়ের নিকট গল্প শুনিয়া শুনিয়া নান্টু সম্বন্ধে মঞ্জুষার যে ধারণা জন্মিয়াছিল সে কাছে আসিতে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। ছোটখাট ছেলেটি। কথা বলে অত্যন্ত মিষ্টি করিয়া। অথচ ক্লাসের মধ্যে সব চাইতে ডানপিটে ছেলেনাকি এই নান্টু—ক্লাসের মনিটার। কথায় কথায় মারপিট করিতে ওর জুড়ি নাই। মঞ্জুষা প্রথমত অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কথা কহিতেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহা স্থায়ী হইল না। মুহূর্তেই ওরা সহজ হইয়া, স্বভাব চাঞ্চল্যে মুখর হইয়া উঠিল।

মঞ্জুষা বলে, তুমি সকলকে অত মারধোর কর কেন ?

নান্টু হাসে। কথার জবাব দেয় না।

মঞ্জুষা পুনরায় বলে, মিনুদাকে কখনও মারবে না কিন্তু।

ওরা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে হাসে। অগভীর ওদের মন, সবল সুস্থ ওদের অন্তর, তাই ওরা এমন সহজ এবং নির্ম্মল।

ইহার পরে নান্টুর ভয় পাইবার মত কোন কারণ রহিল না। বরং স্বেচ্ছায় মৃন্ময়ের সহিত প্রায়ই সে মঞ্জুদের বাড়ী আসা-যাওয়া করিতে লাগিল।

৩

কিন্তু এমনি হালকা হাসি গল্প মান-অভিমানের ভিতর দিয়া জীবনের কয়টা বৎসর আর চলিতে পারে। মঞ্জুষা বড় হইয়া উঠিয়াছে। ওর অনাবশ্যক চাঞ্চল্য যেন স্থির হইয়া গেছে। যদিও মৃন্ময়ের কাছে তার অহেতুক সঙ্কোচ নাই, কিন্তু নিজের চলাফেরা হইতে আরম্ভ করিয়া কথাবার্তা পর্য্যন্ত একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম মানিয়া চলে। সকাল বেলার স্নিগ্ধ বাতাসের

মতই সে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। বড় ভাল লাগে। কাছে বসিয়া হাসিগল্পে মাতিয়া উঠিতে মন উন্মুখ হইয়া থাকে। বয়সটা তার এমনি একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মৃন্ময় এবারে বি, এ, দিয়াছে। মঞ্জুষাও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ডিগ্রির মোহ নাই, কিন্তু মানসিক অগ্রগতি আছে—যদিও কল্পনা তার সীমাবদ্ধ। কিন্তু মৃন্ময় স্বপ্ন দেখে—দেশের মধ্যে এক জন মস্ত বড় হইয়া উঠিবার স্বপ্ন। এম-এ পাশ করিয়া সে বিলাত যাইবে উচ্চশিক্ষার জন্য। সে মানুষ হইবে। মঞ্জুকে বলে, তোমার দাদার মত আমিও বিলেত যাব মঞ্জু। আমি বড়ো হবো।

মঞ্জুষা হাসিমুখে কহিল, বিলেত গেলেই বুঝি মানুষ বড় হয়ে উঠে মিনুদা? দেশের যাঁরা বড় তাঁরা সবাই ও দেশে যান নি। তা ছাড়া অনেকে আবার বড় হতে গিয়ে মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে আসেন। একটু থামিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, আচ্ছা মিনুদা, সত্যি করে বলো ত বড় হবার উপকরণ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে কিসের জন্য। এ কথা ভাবতে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, এতে লজ্জার কিছু নেই মঞ্জু। যে কারণেই হোক ওদের দেশ আজ সব দিক দিয়েই বহুদূরে এগিয়ে গেছে। নিজেদের এ ক্ষতি পূরণ করতে হলে তাদের দোরে না গিয়ে উপায় কি?

মঞ্জুষা কহিল, তোমার এ যুক্তি নিতান্ত মামূলি মিনুদা। শিক্ষা অথবা সংস্কৃতির কথাই যদি বলো; এ ত পরস্পরের পরিপূরক। আদান প্রদানের ভিতর দিয়েই এর প্রসার হয়! ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তাদের দোর-গোড়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে কিসের ক্ষতি?

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখেই কহিল, এ ভিক্ষায় লজ্জা নেই মঞ্জু এমনি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বিদেশের বহু মনীষী এদেশ পর্য্যটন করে গেছেন তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে। আজ পাশ্চাত্যের নব নব আবিষ্কার আমাদের চোখে পরম বিস্ময়, কিন্তু আমাদের দেশেও রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরানিক যুগে বিজ্ঞান-সাধনায় পিছিয়ে ছিল না। ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে যুদ্ধ কিংবা নারদের ঢেঁকিতে আকাশভ্রমণ কোনটাই আজ আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, আমার কথাটাই তুমি বলে ফেলেছ মিনুদা। আমাদের বড় হবার বহু অমূল্য সম্পদ নিজের দেশেই ছড়ান রয়েছে; অপেক্ষা শুধু বেছে নিয়ে তাকে রূপ দান করা। একাগ্র সাধনা দিয়ে কি এ কাজ সম্ভব হয় না?

মৃন্ময় কহিল, সাধনার গোড়ার কথাটা ভুলে গেলে ত চলে না মঞ্জু। শুধু সাধনায় কিছুই হয় না যদি নিজেকে উপযুক্ত করে তৈরী করা না যায়।

মৃন্ময় কহিল, আমার মনে হচ্ছে আমরা অনেক বড় ব্যাপারে মাথা গলিয়েছি। উচ্চশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কি পথ হারিয়ে ফেলি নি! কিন্তু এ সব আলোচনা এখন থাক। তার চেয়ে বল কলকাতায় যাচ্ছ কবে?

মৃন্ময় নীরব রহিল।

মঞ্জুষা একটু হাসিয়া কহিল, তুমি বুঝি রাগ করলে? এতে রাগ করবার কিছু নেই। তোমরা নিতান্তই সমুদ্রের জীব, আমরা সাধারণ পুকুরের। ছোটকে কেন্দ্র করেই আমাদের আশা—আকাঙ্ক্ষার প্রাণ। বৃহতের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে আমরা তাকে চাই না, পারিও না। নিতান্তই সংসারের জীব…বড্ড বেশী সচেতন…হয়তো বা একটু স্বার্থপরও।

মৃন্ময় একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ !

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ আকাশের পাখীর চেয়ে আমরা খাঁচার পাখীর মূল্য দিই বেশী। আর কল্পনার চেয়ে বাস্তব সত্যের।

মৃন্ময় কহিল, ভাল বুঝলাম না।

মঞ্জুষা কহিল, বুঝে তোমার দরকারও নেই। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে শহরে গিয়ে আমাদের ভুলে যেয়ো না।

মৃন্ময় কহিল, এর আগেও আমায় পড়াশুনোর জন্য শহরে থাকতে হয়েছে মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু সেটা মফস্বলের শহর—কলকাতা নয়। ওখানে পাবে তুমি বহু বন্ধু-বান্ধব···নিত্য নূতন নূতন উন্মাদনা। তার উপর তোমার আবার এগিয়ে চলবার যা প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

মঞ্জুষা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মৃন্ময় রাগ করিয়া কহিল, তুমি কি ঠাট্টা করছ নাকি ?

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি কি তাই মনে কর মিনুদা ?

মৃন্ময় কহিল, তা করি না বলেই ত তোমায় ঠিক বুঝতে পারছি না। জীবনে সত্য উপলব্ধি যেদিন হ'ল, অতীতের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলো যখন মহামূল্য হয়ে সত্তাকে নাড়া দিয়েছে তখন তুমি হয়ে পড়লে দুর্বোধ্য।

মঞ্জুষা তেমনি হাসিমুখে কহিল এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ।

মৃন্ময় কহিল, সম্ভবত তোমার কথাই ঠিক। এত তলিয়ে দেখবার মত দৃষ্টির গভীরতা হয়ত আমার নেই, কিন্তু মার তৈরি কাসুন্দি চুরি করে এনে আমবাগানে বসে আমমাখা খাওয়া কিংবা পুতুলের হাত মুচড়ে দিয়ে তোমার কান্না শোনা··· তোমাদের পেছনের বাগানে বসে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, এসব কথা কোন দিনই আমি ভুলতে পারব না। এই সব ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে

নূতন করে ভাবতে আমার ভারি ভাল লাগে। এর মধ্যে আমি সত্যিকারের জীবনস্পন্দন খুঁজে পাই। সেদিনে যা ছিল নিছক ঘটনা আজ তা জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

মঞ্জুষা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিল।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, খেয়াল হ'ল জলপদ্ম নেব। সাঁতার আমি জানি নে। জলে আমার প্রবল ভীতি। তুমি পড়লে জলে ঝাঁপিয়ে। আমার জন্যে ফুল তোলা তোমার চাই অথচ সাঁতারে তুমিও অপটু। গেলে ডুবে। ভাগ্যক্রমে তেওয়ারী এসে উপস্থিত হয়েছিল। অনেক সময় আমি আজও ভাবি ছেলেবেলার এই ভালবাসার কথা। তুচ্ছ কারণেও নিজের জীবন বিপন্ন করতে এতটুকু দ্বিধা আসে নি। আর আজ আমরা নিজেদের চিনতে শিখেছি, বুদ্ধির তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে দেখবার স্পৃহা আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই সহজটাও আজ আর সহজ নয়। আর সেই জন্যেই আমি অতীতকে আঁকড়ে ধরে আনন্দ পাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবর্ত্তন হয়। আমার জীবন কোন্ পথে চলতে সুরু করবে তা আমি জানি না, কিন্তু তাকে একটা কাল্পনিক রূপ দিয়ে মাথা ঘামাতেও আমি ভালবাসি না।

মঞ্জুষা কহিল, তোমার এই অভিযোগও অমূলক। ক্ষণকাল ভাবিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, এ তোমার সাহিত্যচর্চ্চার ভাববিলাস। তুমি রাগ করো না মিনুদা, আমার কি মনে হয় জান? যত রাজ্যের উদ্ভট আর অসঙ্গত খেয়াল তোমার মাথায় বাসা বেঁধেছে। মার কাছে জ্যাঠাইমা সেদিন দুঃখ করছিলেন, তুমি নাকি পৈতে পর্য্যন্ত পর না। যার তার হাতের জল খাও। অবশ্য খাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে যাওয়া ভুল। মানুষের প্রবৃত্তির উপর তা নির্ভর করে। তা ছাড়া আজকের দিনে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তা বলে যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে তোমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, মা মিথ্যে বলেন নি। একগাছা সাদা পৈতে আমায় আর দশ জনের থেকে আলাদা ক'রে রাখবে তা আমার সহ্য হয় না। আমাদের রাধু বোষ্টম, হারাণ নাপিত কিংবা কৃষ্ণগোপাল হাড়ি যে ঐ পৈতে গাছটার মহিমার কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এ আমি সত্যিই বরদাস্ত করতে পারি না মঞ্জু। আমাদের এই জাতিগত বৈষম্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে আমাদের কোথায় টেনে এনেছে একবার ভেবে দেখেছ কি? অথচ তারাও আমাদের মত মানুষ। মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে হয় তো আমাদের চেয়েও বড়। তোমায় স্পর্শ করলে যদি কাউকে স্নান করতে হয় কিংবা তোমার উপস্থিতিতে যদি কোনো দেবমন্দির অপবিত্র হয় তা হলে তাদের সম্বন্ধে তোমার মনোভাব তখন নিশ্চয় খুব প্রীতিকর হবে না। সমাজের বুকের উপর থেকে এই দুষ্ট ক্ষত আমাদের নিরাময় করতে হবে। মানুষের গৃহদ্বার যেন মানুষের জন্য চিরদিন খোলা থাকে। জাতিগত পার্থক্যের আবরণ যেন তাদের গতিপথে বড় হয়ে চোখে না পড়ে।

মঞ্জুষা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, তাই বুঝি পৈতেগাছটা বিসর্জ্জন দিয়েছ মিনুদা। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বয়েসে সবদিক থেকেই তুমি বড়। তোমার যুক্তিতর্কের জোয়ারে আত্মবিশ্বাস, আজন্মের সংস্কার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়; কিন্তু মন তবু বিনা দ্বিধায় সাড়া দেয় না।

মৃন্ময় কহিল, সাড়া দেওয়া বহুদিন আগেই আমাদের উচিত ছিল। তা হলে আজ অন্ততঃ একটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে চলাফেরা করতে পারতাম। কিন্তু এ সব কথা আজ থাক মঞ্জু। তোমাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে যেন।

মঞ্জুষা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ তুলিতেই মৃন্ময়কে কে যেন অকস্মাৎ চাবুক মারিল, ব্যাগ্র কণ্ঠে কহিল, তোমার হ'ল কি মঞ্জু?

মঞ্জুষা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কিছু হয়নি ত।

মৃন্ময় একটু দুঃখিত ভাবে কহিল, তোমরা সকলেই যদি সমান হও তবে যাই কোথায় বল ত। পৈতেটা সত্যই আমি স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিই নি। নদীতে স্নান করতে গিয়ে খোয়া গেছে। মা বলেন ওটা আমার ইচ্ছাকৃত। বুঝলাম তাঁর কাছে যখন তখন বক্তৃতা দেবার পরিণতি এটা! কিন্তু মুখে বললাম, তথাস্তু। এই নিয়েই গোল বেধেছে। মৃন্ময় কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, তোমায় মিথ্যে বলব না মঞ্জু; যে ব্যাপারটা আকস্মিক একটা দুর্ঘটনার মত ঘটেছে তা যদি আমি খোলা মনে নিজে থেকে করতে পারতাম আমিই তা হলে সব চেয়ে খুশী হতাম। কিন্তু এ নিয়ে তুমি এতটুকু বিচলিত অথবা দুঃখিত হবে জানলে কখনই এ আলোচনা করতাম না।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, দুঃখিত ঠিক নয়, কিন্তু আমার যেন কেমন ভয় করে মিনুদা, দাদার কথা সব শুনেছ কি?

মৃন্ময় একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তোমার দাদার! না ত।

মঞ্জুষা কহিল, বলবার মত নয়, বলেই কেউ বলে নি। তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন মেম বউ। উঠেছেন এসে কলকাতার সাহেবপল্লীর একটি ফ্লাটে। মা সেই থেকে বিছানা নিয়েছেন। বাবা কেমন গম্ভীর হয়ে গেছেন। কথাবার্ত্তা বড় একটা কন্ না। মাঝে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। না পারি জোর করে একটু কথা কইতে, না প্রাণ খুলে একটু হাসতে।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার বাবা তোমার দাদা সম্বন্ধে কি বলেন?

মঞ্জুষা কহিল, কিছু নয়। শুধু দেওয়ানজীকে ডেকে বলে দিলেন, নিমুকে পাঁচশ' টাকা করে যেন প্রতি মাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার সম্বন্ধে এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এর পরে আর তিনি একটি কথাও

বলেন নি। এমন কি দাদার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন নি। মঞ্জুষা থামিল।

মৃন্ময়ও চুপ করিয়া রহিল। আজিকার আলোচনার ধারাটা কেন যে সহসা এই পথে মোড় ফিরিয়াছিল তাহার এতক্ষণে একটা কিনারা হইয়াছে।

তেওয়ারী হাঁক দিল। মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, অনেক দিন ত যাও নি। মা তোমার খোঁজ করছিলেন। কাল পার ত একবার যেও। মঞ্জুষা মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, আমাকে যে সব কথা বলেছ—যদি কোন দিন কোন কারণে ঐ প্রসঙ্গ ওঠে একটু বুঝেসুঝে জবাব দিও মিনুদা। সকলে হয়তো তোমায় বুঝবে না—ভুল করবে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আর এক বার আগামী কাল তাদের বাড়ী যাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তেওয়ারীর সহিত বাহির হইয়া গেল।

পরদিন মৃন্ময় কিন্তু জমিদার-বাড়ী না গিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নদীর তীরে বেড়াইতে গেল। ও বাড়ীর শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া হইতে তফাৎ থাকাই ভাল। মঞ্জুর দাদাকে সে কোনদিন দেখে নাই, হয়তো দেখিবেও না, তথাপি একটা বিজাতীয় ঘৃণায় ওর মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। মঞ্জুর দাদা তার মনে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলিয়াছে। মৃন্ময় অন্যমনস্কের মত পথ চলিয়াছে। এমনি আরও কত দূর যে সে অগ্রসর হইয়া যাইত তাহার ঠিক নাই, সহসা পথের মাঝে হিরু নাপিতের সঙ্গে দেখা, দাদাঠাকুর যে, যাবেন কত দূর?

আচমকা বাধা পাইয়া মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল, তোমাদের গ্রামে এসে পড়েছি যে হিরু।

হিরু একটু হাসিয়া কহিল, আজ্ঞে না পেছনে ফেলে এসেছেন। একটু আগেই শ্মশান, এই ভরসন্ধ্যায় আর ওদিক পানে যাবেন না।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চল এক সঙ্গেই এগোই।

হিরু কহিল, চলুন।

মৃন্ময় কহিল, তোমার বাড়ীর খবর ভাল ত, ছেলেপিলে সব কেমন আছে।

হিরু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ভাল আর কোথায় দাদা-ঠাকুর। বুড়ো হয়েছি চোখে ভাল ঠাহর পাই না। লোকজনেরও তেমন ডাক নেই।

মৃন্ময় কহিল, কেন তোমার বড় ছেলে।

করুণ একটুখানি হাসিয়া হিরু কহিল, তা হলে আর দুঃখ ছিল কি। ইংরেজী ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলাম—তাইতেই কাল হয়েছে। বলে, ক্ষুর হাতে নিতে লজ্জা করে। ষ্টীমার কোম্পানিতে বিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করে। এত বোঝালাম যে, ক্ষুর হাতে করে দু' বেলা দু' ঘণ্টা ঘুরে এলেই মাস গেলে নিদেন পঞ্চাশ টাকা রোজগার হবে। কে কার কথা শোনে। যতদিন দেহ বইবে বাপের কাজ ক'রে যাব, তারপর যাক না সব ভেসে। দেখতে ত আর আসব না। হিরু থামিল।

মৃন্ময় নীরব।

হিরু পুনরায় কহিল, একটু পা চালিয়ে এগোন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সাপ-খোপের অভাব নেই। কাল পরাণ মণ্ডলের ছেলেটাকে দিয়েছিল প্রায় সাবাড় করে। একটু দেখেশুনে আওয়াজ করে যাবেন। হিরু একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃন্ময় নদীতীরের নির্জ্জন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পায়ের পাশ দিয়া কি একটা অতি দ্রুত চলিয়া গেল। মৃন্ময় চমকিত হইল। হিরুর উপদেশ স্মরণ হইল। বুকের মধ্যটা কাঁপিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। সম্ভবত অমাবস্যার রাত। তিথিনক্ষত্রের হিসাব মৃন্ময়

রাখে না। গোয়ালন্দ ষ্টীমার দেখা দিয়াছে। সার্চ্চলাইটের তীব্র রশ্মি ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া পথের সন্ধান করিয়া লইতেছে। খরস্রোতা পদ্মা উন্মত্ত বেগে ষ্টীমারের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। দুর্ব্বোধ্য উহার ভাষা, কিন্তু নিজের সামর্থ্যানুযায়ী বাধাদানে পশ্চাৎপদ নয়। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক বাদুর উড়িয়া গেল। মৃন্ময় পুনরায় চমকাইয়া উঠিল। অদূরে মহাশ্মশান। পশ্চাতে কল্পিত ভয়াবহতা, উর্দ্ধে দীর্ঘ নিশ্বাসের চাপা শব্দ, বাঁয়ে জলের উন্মত্ত মাতামাতি, ডাইনে ছোট ছোট ঝোঁপ আর সম্মুখে আঁকাবাঁকা সরু পথ। মৃন্ময় একাকী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এতটা দূর পথ, বিশেষ করিয়া এদিকে সে ইতিপূর্ব্বে একাকী আর আসে নাই। তদুপরি হিরু নাপিতের অযাচিত সতর্কবাণী। ইহা অপেক্ষা মঞ্জুষাদের বাড়ী ঢের ভাল ছিল।

বাড়ী ফিরিতে আজ তাহার অন্তত নয়টা বাজিবে। মৃন্ময় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। মাঝে মাঝে সামান্য শব্দেও উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। উদ্দাম তরঙ্গমালা তীরে আসিয়া ব্যর্থরোষে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। দূর নদীবক্ষে ক্ষীণ আলোকশিখা। হয়তো কোন যাত্রীবাহী নৌকা চলিয়াছে। মৃন্ময় সবিস্ময়ে দেখিল ঢেউয়ের তালে তালে বারকয়েক দোলা খাইয়া নৌকাখানি তলাইয়া গেল। একসঙ্গে কতকগুলি আর্ত্ত চীৎকার, তারপর সব নীরব। শক্তিপরীক্ষায় দুর্ব্বলের নিরুপায়তার একটি করুণ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য।

ষ্টীমারের পাখার বিরামহীন ছপাছপ শব্দ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। মৃন্ময় একবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল। দূর নদীবক্ষে দৃষ্টি প্রসারিত করিল, কিন্তু সুচিভেদ্য অন্ধকারে পদ্মার সাদা জলের উচ্ছৃঙ্খল নর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। মৃন্ময় পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিল। অন্ধকারে হুঁচট খাইতে খাইতে বড় জোর সামলাইয়া লইল।

মৃন্ময় প্রায় গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। রাধু বোষ্টমের গলার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। সম্মুখের ঐ উন্মুক্ত মাঠের এক প্রান্তে তার কুঁড়ে ঘর। রাধু গান গাহিতেছিল—শ্যামা-সঙ্গীত। লোকটির কেমন এক স্বভাব। দিন-রাত বিরাম নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে রাধু নাকি বছর চারেক সংসার-ধর্ম্ম করিয়াছিল। তার পর কোন এক দুর্য্যোগ-রাত্রির অবসানে সে তার কুঁড়ে ঘরখানির সঙ্গে স্ত্রী-রত্নটিকেও হারাইয়াছে। তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। শোনা যায় বর্ত্তমানে সে বৃন্দাবনে আছে। রাধুর কুঁড়ে ঘরখানি আবার হইয়াছে, কিন্তু তার ভাঙ্গা সংসারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অদ্যাবধি করে নাই।

মৃন্ময়ের ইচ্ছা হইতেছিল রাধুকে ডাকিয়া সঙ্গে লয়। এই ঘোর অন্ধকারে পথ চলিতে তার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। আরও খানিক আগে ঐ যে বড় ছাতিম গাছটা মাথা উঁচু করিয়া মূর্ত্তিমান এক স্তূপ অন্ধকারের মত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে উহার বহু ইতিহাসই এককালে সে কম্পিত বক্ষে উন্মুখ হইয়া শুনিয়াছে। আজ এতখানি বয়সেও সেই অতীতের কথা ভাবিতে গিয়া মৃন্ময়ের সমস্ত শরীর ভারী হইয়া উঠিল। মৃন্ময় পায় পায় আসিয়া রাধুর কুঁড়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, বোষ্টমদার গানের গলা আজও ঠিক তেমনি আছে। এই রাস্তায় চলেছিলাম তোমার গান শুনে দাঁড়াতে হল।

রাধু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এত রাতে এই পথে যে দাদাঠাকুর।

মৃদু হাসিয়া মৃন্ময় কহিল, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। অন্যমনস্কভাবে শ্মশানের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পড়ে এই বিভ্রাট।

রাধু চমকিত হইল। কহিল, সাহস থাকা ভাল তা বলে দুঃসাহস ভাল নয় দাদাঠাকুর। ভূত, পেত্নী মানিনে বলে যত বড়াই করিনে কেন রাত বিরেতে ঐ পথে চলতে হবে ভাবতেও হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়—রাধু থামিল এবং অনতিকাল মধ্যে একখানা পাকা বাঁশের লাঠি ও একটি

লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিল। কহিল, চলো একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

রাধুর এই সাধু সংকল্পে মৃন্ময় মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেও প্রকাশ্যে কহিল, তুমি আবার এই রাত্রে···

রাধু হাসিল, কহিল, শুধু গল্পই শুনেছ, চোখে ত আর দেখ নি। তবে বলি শোন,—চাটুয্যেদের বড় বাঁশঝোঁপের পাশ দিয়ে গেছ কোন দিন? দিনের বেলা যেতেই অনেকে আঁতকে ওঠে। সেই পথে এমনি এক আঁধার রাতে একলা চলেছিলাম! হঠাৎ দেখি বাঁশগুলো সব একসঙ্গে নড়ে উঠেছে। অথচ আশপাশের গাছগুলির একটি পাতা পর্য্যন্ত কাঁপছে না। ভাল করে চোখ চেয়ে দেখি রাস্তা জুড়ে বাঁশগুলো সব শুয়ে আছে। তখন বয়সও ছিল। গায়ে শক্তিও ছিল। হাতের লাঠিগাছা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলাম—পথ আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু চোখের সুমুখ দিয়ে ছুটে চলে গেল একটা কালো বেড়াল। তার ভাঁটার মত গোল গোল চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের গোলার মত জ্বলছে। হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। বেড়ালটা সহসা পঞ্চবটীর গাছগুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবলাম আপদ গেছে। কিন্তু তার পরেই দেখি পঞ্চবটীর অশথ গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি রোগা বৌ ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশ দিয়ে এক ঝলক দমকা হাওয়া ছুটে গেল—কারুর চাপা হাসির হা হা শব্দের মত। তার পরই সব স্তব্ধ। ভাল করে চেয়ে দেখি সে বৌটিও আর সেখানে নেই। সেই থেকে অন্ধকার রাতে আর ও পথ দিয়ে চলাফেরা করি না।

মৃন্ময় মনে মনে ভয় পাইলেও মুখের জোর ছাড়িল না। কহিল, গল্প হিসেবে শুনতে মন্দ নয়।

রাধু হাসিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমাদের মত ছেলেছোকরাদের নিয়েই দিন কাটাই আর এ সহজ কথাটা বুঝি নে দাদাঠাকুর। মুখের জোরে

আমায় উড়িয়ে দিচ্ছ বটে, কিন্তু নিজের মনের কাছে কি জবাব দেবে শুনি! সেখানে হার তোমায় মানতেই হবে। একটু থামিয়া রাধু বোষ্টম সুরু করিল, তা হলে বলি শোন—ঘোষপাড়ার পোড়ো ভিটের গল্প শুনেছ?

মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি জোর করে আমায় ভূত বিশ্বাস করাবে বোষ্টম-দা?

রাধু বলিল, কিন্তু ঘোষপাড়ার গল্প শুনলে তোমায় স্বীকার করতেই হবে যে···

মৃন্ময় হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, আমি এমনিতেই স্বীকার করছি বোষ্টম-দা। দোহাই তোমার, ঘোষপাড়ার কথা এখন থাক তার চেয়ে একখানা রামপ্রসাদী হোক।

রাধু তার লণ্ঠনের আলোটা ভাল করিয়া উস্কাইয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, পথ চলতে চলতে কি আর ওসব সাধন-ভজন হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পথ চলিতে চলিতেও রাধুর ভজন গান অনায়াসে চলিতে পারে।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, তেমন অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় কি বোষ্টম-দা!

মুহূর্ত্তের জন্য গান থামাইয়া রাধু উত্তর করিল, হলেই বা করছি কি। পুনরায় রাধুর কণ্ঠে সুর খেলিয়া চলিল।

জমিদার-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহাদের অল্পক্ষণের জন্য থামিতে হইল। তেওয়ারীর সহিত রাধুর কুশলপ্রশ্নের আদান-প্রদানের সময়টুকু মাত্র। রাধু পুনরায় চলিতে সুরু করিল। আর একটা বাঁক পরেই মৃন্ময়দের বাড়ী। রাধু কহিল, আজ সকাল বেলা এ দিক থেকে ঘুরে গেছি। তোমার মার দয়ায় দিন কয়েক চলবে। ভিক্ষে আজকাল আর কেউ দিতে চায় না। পেরেও ওঠে না। ভাবছি কোথাও একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে নেব। নদীর

ওপারে বড় তরফের একটা কারখানা হবে শুন্‌ছি। এ পারের আরও অনেকে যাবে বলছিল। রাধু সহসা থামিল, কহিল—এবারে তুমি একলাই যেতে পারবে। বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পিছন ফিরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল। একবার ফিরিয়া চাহিল না পর্য্যন্ত।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল। আর সামান্য পথই অবশিষ্ট আছে।

৪

পরদিন প্রত্যূষে······

মৃন্ময় প্রাত্যহিক উষাভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশে ফিরিলে এটা তার নিত্যকর্ম্ম। অল্পক্ষণেই মুখ হাত পা ধুইয়া একখানা বই খুলিয়া বসিল। গত রাতটা তার একটা অত্যদ্ভুত স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। কালো বিড়ালটার জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, রোগা বৌটার দাঁত-বাহির-করা হাসি বহুক্ষণ তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর কখন এক সময় যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তার নিজেরই হুঁস নাই। কিন্তু প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিতে অতি সহজেই সে আবিষ্কার করিল যে, গত রাত্রের মনের উপরকার সে পাষাণভার আজ আর নাই।

যেমন হীরু নাপিত তেমন রাধু বোষ্টম। ভয় দেখাইতে কেহই কম যায় না। আর তেমনি তার মনের জোর। মৃন্ময় একলা একলাই খানিকটা হাসিল।

মা আসিয়া শুধাইলেন, তোর চা এখানে পাঠিয়ে দেব মিনু?

মৃন্ময় বলিল, দাও মা।

মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, চায়ের সঙ্গে কি খাবি ? গোটা কয়েক মুড়ির মোয়া দেব ? কাল করেছি।

মৃন্ময় কহিল, আপত্তি নেই মা, কিন্তু নারকেল কোরা দিতে ভুলো না যেন।

মা চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আহার্য্য ও চা টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন।

মৃন্ময় রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"র পাতা উল্টাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল। মঞ্জুষার আকস্মিক আগমনে বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, এত সকালে তুমি।

মঞ্জুষা কহিল, চা খেতে এলাম। কিন্তু কাল তুমি গেলে না কেন মিনুদা ?

মৃন্ময় বলিল, নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। আজ যাব। একটু থামিয়া অকস্মাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল। কহিল, তোমাকেই যে এতক্ষণ মনে মনে চাইছিলাম এ কথাটা তুমি কাছে আসতেই আরও পরিষ্কার হয়ে গেল মঞ্জু।

বিস্মিত চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া মঞ্জুষা কহিল, তার মানে ?

মৃন্ময় কহিল, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিখানা পড়ছিলাম।

মঞ্জুষা বলিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আসার সম্পর্ক কি ?

মৃন্ময় কহিল, এ সব বই একলা পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু আমার এখনও চা খাওয়া হয় নি। তা ছাড়া ঐ সব জটিল তত্ত্ব আমি বুঝিনে, ভালও লাগে না। মঞ্জুষা আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। মৃন্ময় চেয়ারটা ঘুরাইয়া দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া

গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই সে উঠিয়া পড়িল। মঞ্জুষার সাক্ষাৎ মিলিল ভাঁড়ার-ঘরে। মৃন্ময়ের মায়ের নিকট বসিয়া সে নির্ব্বিকার ভাবে কুটনা কুটিতেছে ও মাঝে মাঝে নিতান্ত অভিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছে।

মৃন্ময় দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মা কহিলেন, তোর আবার কি চাই মিনু ?

অকস্মাৎ মৃন্ময়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, আর দুটো মুড়ির মোয়া! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্য কথা পাড়িল, কিন্তু কাকে দিয়ে কি করাচ্ছ মা!

মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, অভ্যাসের গুণে হাতের আধখানা ও যদি নামিয়েই দেয় তখন কিন্তু দোষের বোঝা তোমার মাথায়ই পড়বে।

এ এক আচ্ছা পরিহাস বটে! মা হাসিয়া কহিলেন, তোর অন্য কোন কথা না থাকলে এখন যেতে পারিস। মোয়া আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময় আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না।

খানিক পরে মঞ্জুষা আসিয়া যখন মৃন্ময়ের ঘরে প্রবেশ করিল তখন সে চোখ বুজিয়া কি চিন্তা করিতেছে। মঞ্জুষার আগমন টের পায় নাই।

মঞ্জুষা কহিল, অতগুলো মোয়া পড়ে আছে আর মোয়ার নাম করে মিছি মিছি যা নয় তাই বলে এলে।

মৃন্ময় চোখ চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, মিথ্যা সকলের কাছেই পীড়াদায়ক মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, এ তোমার অন্যায় রাগ মিনুদা। যা সত্যিই আমি বুঝি না, তা কেমন করে তুমি আমায় জোর করে ভাল লাগাবে। তোমার নান্টুদার কবিতা শোনাতে চাইলে ত কখনও ভাল না লাগার দোহাই দিয়ে আমি পালিয়ে যাই না। যে যেমন লোক তার ভাল লাগাটাও ঠিক

তেমনি হয়ে থাকে। এ সোজা কথাটা যদি না বোঝ তবে আমি কি করি।

মৃন্ময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, তোমায় বলতে ভুলেছি, কাল নান্কুর চিঠি পেয়েছি।

মঞ্জুষা কহিল, এই প্রায় চার বছর সে নিরুদ্দেশ হয়েছে আর এত দিন পরে তার মনে পড়ল! কোথায় আছে সে? লিখেছে কি?

মৃন্ময় কহিল, জানি না। ঠিকানা দেয় নি। লিখেছে, প্রয়োজনমত জানাবে, কিন্তু কভারে ছাপ দেখলুম এক পাহাড়িয়া অঞ্চলের। ওখানে নাকি সে বেশ আছে। স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন ওর গতি। তার অবারিত চিন্তার পথে কেউ বাধার সৃষ্টি করে না। ওখানে কোন এক ধনী পাহাড়িয়া মেয়েকে নান্কু বাংলা শেখায়। ওর প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারাই দিয়ে থাকে।

মঞ্জুষা কহিল, নান্কুদার বাড়ীতে এ খবর দিয়েছ?

মৃন্ময় কহিল, না। নান্কুর খবর গোপন রাখতে সে বিশেষ করে আমায় অনুরোধ করেছে। ওর খোঁজ করতে গেলে লাভ কিছু হবে না। মাঝে থেকে তাকে আবার নূতন পথের সন্ধানে বেরুতে হবে। ঘরকে সে নাকি ছাড়বার জন্যেই ছেড়েছে, ফেরবার জন্যে নয়। ওখানে সে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। জায়গাটাও চমৎকার।

মঞ্জুষা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কথা কিছু লেখে নি?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, লিখেছে বৈ কি। তোমার কথা নিয়ে প্রায় পাতাখানেক ভরিয়ে ফেলেছে। লিখেছে—মঞ্জু এখন কত বড়টি হয়েছে। আগের মত এখনও ময়ূর, খরগোস আর ডল নিয়ে মেতে থাকে কিনা? তেমনি করে কথায় কথায় তোর ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে কিনা। দুষ্টুমি করলে কান মলে দিই কিনা…

মঞ্জু হাসিয়া ফেলিল, কহিল, সব কথা মনে আছে ত বেশ !

মৃন্ময় পুনশ্চ কহিল, লিখেছে, এখানে সকলে আমায় মাথায় করে রেখেছে। এতটা আমার ভাল লাগে না। এর চেয়ে মঞ্জুর মত একটি মেয়ের প্রয়োজন আমার বেশী, যে কথায় কথায় অভিমান করে কথা বন্ধ করতে পারে···রাগ করে কিল চড় দিতেও যার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। এমনি একটি সহজ সঙ্কোচহীন মেয়েকে যদি পেতাম তা হলে দিনগুলি আমার আরও মধুর হয়ে উঠত।

মৃন্ময় থামিল। একটু হাসিয়া কহিল, পাগল আর কাকে বলে। ওর ধারণা তুমি এখনও ঠিক তেমনিই আছ। তেমনি সহজ আর তেমনি সরল। বয়োধর্ম্মকে পর্যন্ত নাঙ্কু ভুলতে বসেছে। ও সব দিক দিয়েই কবি হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক নাঙ্কু কিন্তু মঞ্জুকে খুব ভালবাসে। মঞ্জু তার প্রবাস-বাসের একটা সচেতন চিন্তা।

মঞ্জুষা রাগ করিয়া কহিল, এ সব তোমার গায়ের জোরের কথা। অন্যায় কথা···অসঙ্গত কথা।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, মঞ্জু রাগ করেছ। কিন্তু সত্যিই এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। একটু ভেবে দেখলে তুমিও একথা বুঝতে পারবে। নাঙ্কু-বর্ণিত মঞ্জুষা মৃন্ময়ের ঘাড়ে চড়ে। প্রয়োজনমত কিল-চড় দেয়—দিনের মধ্যে পাঁচ বার আড়ি করে, সাত বার ভাব করে। তাকে ভালবাসা মানে নিতান্তই স্নেহ করা। বয়সের তফাতেই ওর রূপ আলাদা হয়—এ সাধারণ কথাটাও তুমি বুঝবে না এ আমি কেমন করে জানব।

মঞ্জুষা তথাপি নীরব।

মৃন্ময় পুনরায় একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতে কহিল, তোমাকে দোষ দেব না, কারণ তোমার আসল ব্যাধি কোথায় সে আমি জানি।

মঞ্জুষা কহিল, ডাক্তারী বিদ্যেটাও আয়ত্ত করেছ দেখছি, কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস এখনো শিক্ষানবিশী চলছে। তাই বলছিলাম যে, রোগনির্ণয়ের

আগে দু'এক জন অভিজ্ঞের সাহায্য নিয়ো, তাতে হয়তো অনেকের যন্ত্রণার লাঘব হবে।

মৃন্ময় হাসিমুখে উত্তর দিল, কিন্তু যে ইচ্ছে করে কেউটে সাপের মুখে হাত ঠেকিয়ে যন্ত্রণাকে ডেকে আনে তার জন্যে কোন বিধি-ব্যবস্থাই চলে না। না হাতুড়ের না অভিজ্ঞের।

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল। মৃন্ময়ের কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, ইচ্ছে করে কেউ কেউটে সাপের মুখে হাত দিতে যায় না মিনুদা, যদি না এর পেছনে বড় কোন আকাঙ্ক্ষা লুকানো থাকে। মঞ্জুষা ক্ষণিকের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, সেপ্‌টিক হবার কোন আশঙ্কা নেই জেনেও যারা কাটা-ঘায়ে টিংচার আইডিন লাগায়, তারা অত্যধিক হুঁসিয়ার হলেও যার উপর প্রয়োগ করা হয় তার কাছে তা যন্ত্রণাদায়ক হয় যে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সামান্য একটু কাঁটার আঁচড়ে যারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় তাদের সম্বন্ধে তুমি কি বিধান দেবে মঞ্জু?

মঞ্জুষা রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমি জানি না।···সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিল, কহিল, যেয়ো না মঞ্জু, দরকার আছে।

মঞ্জুষা থামিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃন্ময়ের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া আছে। মঞ্জুষা দুখানি হাত আলগোছে তার কাঁধের উপর রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, কি—ডাকলে কেন?

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

মঞ্জুষা আরও একটু ঘন হইয়া দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? চলে যাব নাকি? চোখ দুটি ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঘর্ম্মবিন্দু।

মৃন্ময় তার কাঁধের উপর ন্যস্ত মঞ্জুর দুখানি হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, দুটো মোয়া খেয়ে যাও মঞ্জু।

মঞ্জুষা সহসা তার হাত টানিয়া লইয়া কহিল, না···আমি যাই। সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

মৃন্ময় কতকটা বিস্মিত এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে মঞ্জুষার দ্রুত অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল।

৫

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে মঞ্জুষার সাক্ষাৎ মিলিল মৃন্ময়ের শয়ন-কক্ষে। মৃন্ময় তখন ঘরে ছিল না। শয্যার উপর খানকয়েক বই ইতস্ততঃ ছড়ান ছিল। মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলা। মঞ্জুষা আপন মনে গজ গজ করিতেছিল, মিনু-দা যেন কি! এর মধ্যে আবার মানুষ থাকতে পারে। যত বাবুয়ানা জামা কাপড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুষার হাত দুখানিও সক্রিয় হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বইগুলি টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিতে গিয়া সে আবিষ্কার করিল নাঙ্কুর একখানি সুদীর্ঘ পত্র। মঞ্জুষার মন কুতুহলী হইয়া উঠিল। এই চিঠি লইয়াই মৃন্ময় সেদিন কত না আজেবাজে বকিয়াছিল! তা ছাড়া নাঙ্কুর খাপছাড়া জীবন যাত্রাকে মঞ্জুষা খানিকটা যেন করুণার চোখে দেখে।

নাঙ্কু লিখিয়াছে—অনেক দিনের একটা পুরনো কথা আজ বার বার মনে পড়ছে। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। বাল্যকালটা হয়তো সেইজন্যই খুব আদরে কেটেছে। লোকে বলত--অভাগা। যাদের মা আছে সেই সব ছেলের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে মনে মনে হেসেছি, আর যারা আমায় কৃপার চক্ষে দেখেছে তাদের বলেছি নির্ব্বোধ।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তারা মিথ্যে বলত না। মার স্নেহের কোল যদি আজ আমার অপেক্ষায় খালি থাকত কি সাধ্য ছিল আমার এমনি করে ভেসে বেড়াবার। তুমি হয়তো এক্ষুনি প্রতিবাদ করে বসবে, বলবে আমার দাদার কথা, আমার বৌদির কথা যাঁরা আজও আমায় স্নেহ করেন। করেন না এমন কথা আমি বলছিনে, কিন্তু সাংসারিক অভাব-অনটনের চাপে তাঁদের স্নেহের রূপ বদলে গেছে। তাঁদের প্রীতি আজ আমার উপার্জ্জিত অর্থের প্রয়োজনে স্বভাবধর্ম্মকে ভুলেছে। আমি খামখেয়ালী—উপার্জ্জনের প্রতি কোন দিনই আমার তেমন আগ্রহ নেই, কিন্তু অভাবের সংসার সে কথা শুনবে কেন। সে তার অসংখ্য দাবি নিয়ে আমার পিছনে তাড়া করছিল। কিন্তু আমাকে যে নিজের মত করে বাঁচতে হবে, তাই গৃহত্যাগ করেছি। তার পর সুরু হ'ল নিজেকে নিয়ে ভেসে বেড়ান। দীর্ঘ চার বৎসরের ঘোরাফেরার পর স্থির হয়ে দাঁড়াবার একটা আশ্রয় পেতেই সর্ব্বপ্রথম তোমার কথা মনে পড়ল। ভেবেছিলাম আর হয়তো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে না, কিন্তু জীবনের সূচনায় যে দুর্ভাগা জীবনসংগ্রামে হেরে গেছে তার ভবিষ্যৎ সাধারণতঃ একটু অন্ধকারই হয়ে থাকে। আমিও তার থেকে বাদ পড়ি নি।

তুমি হেসো না মিনু। এ আমার ভাবপ্রবণতা নয়। জীবনের একটি অতি সত্য অনুভূতির কথা তোমাকে জানাচ্ছি। আমি বড় আঘাত পেয়েছি, যার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই এর আকস্মিকতা আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। আমি কবিতা লিখি। মেয়েপুরুষের মনের বহু অলিগলির সন্ধান আমার জানা এমনি একটা অকারণ দম্ভ আমার মধ্যে ছিল। আমার নির্ব্বোধ অহঙ্কারই আমার সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। আমি হেরে গেছি এক সহজ সরল পাহাড়ী মেয়ের কাছে।

চন্দনাকে আমি বাংলা পড়াতাম। মেয়েটির চালচলন, কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই একটা সুষ্ঠু ভাব ছিল। আঁটসাট বলিষ্ঠ গড়ন। তার পরিপূর্ণ যৌবন কোথাও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আপন মহিমায় তা সুপ্রকাশ। চোখে বিলোল কটাক্ষ নেই, রুদ্রমধুর ভাবে তা উজ্জল। জ্বালা নেই, আছে দ্যুতি। চন্দনাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল।

ওকে দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করতে বুক কাঁপে। অথচ অনাবশ্যক রূঢ়তা না আছে তার কোন কাজে, না কথায়।

এই বিচার-বুদ্ধি যদি প্রথম থেকেই আমার থাকত, হয়ত আজ আবার আমাকে নতুন করে অজানার পথে পা বাড়াতে হ'ত না। কিন্তু আমার লোভী মন আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। চন্দনার অকপটতা আমার ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করেছে।

দুর্ব্বল মন যখন এমনি এক সন্ধিক্ষণে দোলায়মান, চন্দনার সাগ্রহ আহ্বান এল। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়িয়া নদী মূর্তিমতীর তীরে এসে দু'জনে উপস্থিত হলাম। এমন ত আরও কতদিন এসেছি, কিন্তু আজকের দিনের বিভ্রান্তি আমার জীবনকে তিক্ত করে দিয়েছে। একখানা বড় পাথরের উপরে দু'জনে পাশাপাশি বসেছি। পাড়াগাঁর গল্পে ওকে মাতিয়ে তুলেছি। কখনও বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, কখনও হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

চন্দনা প্রশ্ন করে, মাষ্টার বাবু তুমি দেশে যাও না কেন?

কি উত্তর দেব। বলি, দেশে আমার কেউ নেই। আমি একেবারে একা।

অনুকম্পায় চন্দনার চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, তুমি বিয়ে করবে না মাষ্টারবাবু ?

হেসে জবাব দিলাম. না। আমার প্রয়োজন নেই।

চন্দনা কথা বললে না, মুখ নত করলে।

দু'হাতে তার মুখ তুলে ধরলাম, চোখে তার জল।

অবাক হয়ে গেলাম, এবং সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে বড় বেশী দুর্ব্বল বলে মনে হ'ল। বুকের মধ্যে উষ্ণ রক্তস্রোত উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আমি ভুল করলাম।

চন্দনার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটি মুহূর্ত্তের জন্য জলে উঠল, কিন্তু কথায় তার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেল না। শান্ত মৃদুকণ্ঠে সে বললে, মাষ্টারবাবু, তুমি দেশে চলে যাও। আমি তোমায়…' তাকে বাধা দিলাম, আমি ভুল করেছি চন্দনা।

চন্দনা যে কত কঠিন তা এবারে বোঝা গেল। সে বিকৃত কণ্ঠে বললে ভুল তুমি কর নি—আর সেইজন্যেই তোমাকে যেতে হবে। আমার কথার অবাধ্য হয়ো না। তা হলে নিজের আরও ঢের বেশী অনিষ্ট তুমি করবে।

আমি পুনরায় একটা কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত হতেই চন্দনা আমায় থামিয়ে দিয়ে, তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললে, তোমার দোষ কি মাষ্টার বাবু— বোনের স্নেহ ত কোন দিন পাও নি…

আমারই শেখান কথা আজ আমারই উপর প্রয়োগ করেছে।

চন্দনার বাবার কাছে আমি চির বিদায় প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করতে চান নি। চন্দনা বলে, বাংলা ভাষার উপর সে শ্রদ্ধা হারিয়েছে। যেটুকু আয়ত্ত করেছে তাও সে ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

নিজেকে পুনরায় ধিক্কার দিলাম। এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকবার ইচ্ছা নেই। আগামী কাল কোথায় থাকব তা জানি না।

ইতি—নান্টু

মঞ্জুষা বারবার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িল। মনে মনে নান্টুকে অনুযোগ দিল। ছি ছি নান্টুদা এমন চঞ্চলমতি। আর চন্দনা···কি জানি কেমন মেয়ে সে!······

মৃন্ময় ইতিমধ্যে বারকয়েক ঘরের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা তাহা টের পায় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া কথাটা সে মঞ্জুকে জানাইয়া দিল।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, সত্যিই বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। নান্টুদার চিঠিটা পড়ছিলাম। নান্টুদা যেন কি! একটা উচিত অনুচিত জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

মৃন্ময় কহিল, উচিত অনুচিতের প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভাল। মানুষের মনের বিচিত্র গতি কখন যে কোন্ পথ অনুসরণ করতে চায় তা বোঝা বড় শক্ত ব্যাপার। তোমার দাদার বিষয় নিয়েও এতক্ষণ এই সব কথাই হচ্ছিল।

মঞ্জুষা কহিল, আমাদের বাড়ী থেকেই আসছ বুঝি?

মৃন্ময় কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জুষা কহিল, দাদার সম্বন্ধে মার সঙ্গে বুঝি আলোচনা হচ্ছিল?

মৃন্ময় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ···তিনি কি বলেন জান? ছেলের অন্যায়কে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁর মতে তাকে ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত হয় নি।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু তাকে পুরোপুরি ত্যাগ বাবা ত করেন নি। মাসে মাসে পাচ শ' করে তা হলে দিয়ে যাচ্ছেন কিসের জন্য। অথচ মা কিছুতেই বুঝবেন না। অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে পারি নি।

মৃন্ময় কহিল, আমিও পারি নি। ঠিক এই কারণেই তোমার বারবার বলা সত্ত্বেও এতদিন যাই নি। তিনি বলেন তোমার দাদার পাওনা মাত্র পাচ শ' টাকায় শেষ হয়ে যায় না। উপরন্তু তিনি যেন বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে আমায় উদ্দেশ করে বললেন যে, সবাই মিলে আমরা তোমার দাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি। এই ভয়ই আমার সবচেয়ে বেশী ছিল মঞ্জু।

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে কহিল, মার কথায় তুমি দুঃখিত হয়ো না মিনুদা। নইলে বাবাকেও মা বুঝবার চেষ্টা করেন না। আমার মুখে হয়ত এসব কথা ঠিক শোভন হচ্ছে না। তবুও না ব'লে পারছি না যে, বাবা বলেই আজও দাদার কথা তিনি ভাবছেন। সকলেই বাবার নির্লিপ্ত ভাবটা লক্ষ্য করে, কেউ তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে না। আমার মা পর্য্যন্ত না। আর এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। মা বলেন, মায়াদয়া বাবার শরীরে নেই। আচ্ছা মিনুদা, দুঃখ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি খালি চোখের জল ফেলা? যে আঘাত দিনে দিনে একটা লোকের স্বভাব পর্য্যন্ত বদলে দিয়েছে তা লোকের চোখে পড়ে না কেন?

মঞ্জুষা থামিল। তার দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

মৃন্ময় নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, বাবার মুখের পানে তাকাতে আমার ভয় করে মিনুদা। মার কাছে গেলে উঠি হাঁপিয়ে। তাই যখন তখন তোমার কাছে ছুটে আসি। বাড়ীর আবহাওয়া আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মৃন্ময় এতক্ষণে পুনরায় কথা কহিল, তোমার মাকে দোষ দেওয়া বৃথা! সব মা-ই ঠিক এই কথা বলতেন। তর্কবিচার নেই, কোন বিধান নেই, এমনি যুক্তিহীন তাদের দুর্ব্বলতা—মেয়েদের মাতৃত্ব। অথচ এই নিয়েই তাদের গর্ব্বের অন্ত নেই।

মঞ্জুষা স্থির দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার চোখে মুখে কেমন এক প্রকারের বিস্ময়। তার এই ভাব পরিবর্ত্তন মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে পুনরায় কহিল, কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে একথা আমি বলি নি। নইলে কে না জানে যে, পৃথিবীতে মানুষ বলে পরিচয় দিতে গেলে মেয়েদের আঁচল ধরেই সকলকে উঠে দাঁড়াতে হয়। ওদের বুকের কোমল বৃত্তিগুলিই আমাদের বেঁচে থাকবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

মঞ্জুষা একটু হাসিয়া কহিল, যদি তোমার কথাই সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তা হলেও কি মেয়েদের গর্ব্ব করবার মত কিছু নেই মিনুদা। যে দুর্ব্বলতা মানুষ সৃষ্টি করে তা কি এতই উপেক্ষার বস্তু? কিন্তু তর্ক থাক। অনেকক্ষণ এসেছি এখন যাই।

মৃন্ময় কহিল, আর একটু বসবে না?

মঞ্জুষা কহিল, না। আর একদিন তোমার কথা রাখব।

মৃন্ময় কহিল, যে কাজে হাত দিয়েছিলে তাও কি শেষ না করেই যাবে? না সেটাও আর একদিনের জন্যে মুলতুবী থাকবে।

মঞ্জুষার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল, আজকের জন্যে না হয় একটু স্বাবলম্বী হলে। সময়ের খেয়াল ছিল না। তুমি রাগ করো না মিনু-দা—একটু থামিয়া মঞ্জু পুনরায় কহিল।

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, রাগ করব কেন। তা ছাড়া সব অবস্থার সঙ্গেই আমি মানিয়ে চলতে পারি। কিছু অসুবিধে হয় না।

মঞ্জুষা কহিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মঞ্জুষা ক্ষণকাল পরে পুনরায় কহিল, তোমার কলকাতা যাবার দিন ত প্রায় ঘনিয়ে এল। বিকেলে একবার যেয়ো। সত্যি নিজেকে বড় একলা মনে হয়।

মৃন্ময় প্রতিশ্রুতি দেয়। মঞ্জুষা প্রস্থান করে।

ইহারই দিন কয়েক পরে মৃন্ময় গ্রাম ত্যাগ করিল।

৬

প্রায় দেড় বছর পরে।

এই দীর্ঘ সময়টা মৃন্ময়ের এক প্রকার ভালই কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে বারতিনেক সে গ্রামে গিয়াছে। গ্রামের সে দিন আর নাই। ও তরফের বড়বাবুর বিরাট কারখানা এতরফের বহু ক্ষয়ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাড়ি, বাগ্‌দী ও নমঃশূদ্রপাড়ার জোয়ান পুরুষরা বড়বাবুর জয়গানে গ্রামকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাদের গৃহলক্ষ্মীরা দিবারাত্র অভিশাপ দিয়া চলিয়াছে। বড়বাবুর কারখানা পয়সা দেয় ভাল। তিনি সজ্জন ব্যক্তি। জনমজুরদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি। কারখানার সঙ্গে তিনি শরাবখানা খুলিয়াছেন। মজুরদের সপ্তাহান্তে বেতনের বার আনা কারখানায়ই দিয়া আসিতে হয়। গৃহলক্ষ্মীদের অভিশাপ বোধকরি সেইজন্যই। শান্তি গিয়াছে, অভাব বাড়িয়াছে। খবরগুলি মঞ্জুষার চিঠিতে মৃন্ময় জানিয়াছে এবং গতবার দেশে গিয়াও নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। গ্রামকে মৃন্ময় ভালবাসে। বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর জীবন্ত মানুষগুলিকে, যারা গ্রামের হৃৎস্পন্দনস্বরূপ, প্রকৃতির ঐশ্বর্য। শত অভাব, শত অনটনের মধ্যেও যারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া

লড়াই করিতে পারিত আজ তাহারা কারখানার শ্রমিক—শরাবখানার দাস। ভাবিতেও মৃন্ময় ব্যথিত হয়। ইচ্ছা হয় উহাদের মধ্যে ছুটিয়া যায়। ওদের বর্ত্তমান জীবনের কদর্য্য দিকটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সময় কোথায়। আর কয়েকটা মাসের ব্যবধানে তার হাতে পর্য্যাপ্ত সময় দেখা দিবে। তখন—

রুদ্ধ জানালাটা সশব্দে খুলিয়া যাইতে মৃন্ময়ের চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। বাহিরে বেগে বাতাস বহিতেছে। দুর্য্যোগ দিন। আকাশে স্তবকে স্তবকে সাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—কোথাও কালো মেঘের জমাট স্তুপ। হোষ্টেলের ছেলেরা অনেকক্ষণ হইল দল বাঁধিয়া সহরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়াছে। এত জল নাকি দশ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। মৃন্ময় কতকটা দলছাড়া। কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল মাতামাতির মধ্যে সে নাই। নিজের পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আজিকার এই বর্ষণক্লান্ত আকাশ, উন্মত্ত প্রকৃতি তাহাকে আনমনা করিয়া তুলিয়াছে। মনে পড়িতেছে মঞ্জুষাকে, গ্রামকে আর তার অসহায় সন্তানদের। সেই সঙ্গে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে তার বহু সহপাঠী। বি-এ পরীক্ষার পর তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। বিমান ফেল করিয়াছে। অশোক কোন রকমে উতরাইয়া গিয়াছে। নিতান্ত সাদাসিধা ছেলে সুশীল গিয়াছে বিলাত। অঙ্কশাস্ত্রে ক্লাসের মধ্যে যে ছিল সকলের চেয়ে কাঁচা, সে গিয়াছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে। আর সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, দুলাল গিয়াছে ডাক্তারি পড়িতে। ডিসেক্সন ক্লাসে জ্ঞান না হারাইলে রক্ষা!

মৃন্ময়ের চিন্তার সূত্র পুনরায় ছিঁড়িয়া গেল। শ্রীমান দেবল আসিয়াছে। দেবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, আপনি গেলেন না মৃন্ময়বাবু—আজকের বেড়ানটা সত্যই উপভোগ্য হয়েছে।

মৃন্ময় একটু হাসিল। জবাব দিল না।

দেবল কহিল, আপনি হাসছেন! কিন্তু জীবনে এও এক চমৎকার রোমান্স। আমাদের বাঙালী জীবন এমন একঘেয়ে এবং বেসুরো যে···

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, আপনার বক্তৃতা সেদিন ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিট্যুটে শুনেছি, চমৎকার বলেন আপনি।

দেবল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, এই এক আপনার মস্ত দোষ। নিজে পছন্দ করেন না বলে আর কাউকে তা আলোচনা করতেও দেবেন না। সে চলিয়া গেল।

এদের এই হৈ চৈ মৃন্ময়ের আজ ভাল লাগিতেছিল না। নির্জ্জনে চিন্তায় সময় কাটাইতে পারিলেই ভাল হয়। কিছুদিন যাবৎ প্রতিনিয়তই সে ভাবিতেছে। মঞ্জুষার মার অবস্থা নাকি মোটেই ভাল নয়। যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা কিছু ঘটিয়া যাইতে পারে। ফলে মঞ্জুষার সহিত বিবাহ ব্যাপারটা অনতিবিলম্বে চুকাইয়া ফেলিতে উভয় পক্ষ হইতে তাগিদ আসিয়াছে। মঞ্জুষাকে বিবাহ—কথাটা যে আজ নূতন করিয়া সে ভাবিতেছে তা নয়। মৃন্ময়ের অন্তরের অনেকখানি জুড়িয়া সে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এম-এ পাশ না করিয়া সে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। একথাটা সে পরিষ্কার করিয়াই তার বাপমাকে জানাইয়া দিয়াছে।

মঞ্জুষার নিকট মৃন্ময়কে নিয়মিত চিঠি দিতে হয়। মঞ্জু বেপরোয়া। সঙ্কোচের ধার ধারে না। চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হইলে নানা অনুযোগ এবং লম্বা লম্বা উপদেশ বর্ষিত হয়। মৃন্ময়ের হাসি পায়। আমোদ লাগে। মঞ্জুষা তার গোপন চিন্তায় দেখা দেয়—দেখা দেয় মৃন্ময়ের মনের নিভৃতে। মুখে তার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করে না। তার আশে পাশের সকলকেই সে জানে। মঞ্জুষার চিত্তবৃত্তিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া সকলে বিচার করিতে বসিবে একথা ভাবিতেও

নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মৃন্ময়ের মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। কথায় কথায় মঞ্জুষাকে লইয়া উহারা বিদ্রূপ করিবে, তার সারল্যকে ছলনা অথবা বাড়াবাড়ি বলিয়া উপহাস করিবে, কিংবা মুখে মুখে তার কথা আলোচিত হইবে এ যেন নিতান্তই একটা সস্তা নাটকীয় ব্যাপার। স্নেহের পাত্রীকে সাধারণের চোখের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া যাহারা বাহাদুরি নেয় মৃন্ময় সে শ্রেণীর নয়।

দেবল আসিয়া পুনরায় দেখা দিল, কহিল, বলতে ভুলেছিলাম—মাপ করবেন।

মৃন্ময় বিস্মিত চোখে দেবলের মুখের প্রতি চাহিল।

দেবল কহিল, আপনার বড়লোক বন্ধু সুনির্ম্মল বাবু এসে ফিরে গেছেন।

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু আমি ত সারাদিন কোথাও বেরুই নি।

দেবল কহিল, সে খবর আমার রাখবার কথা নয়। মোটের উপর তিনি এসেছিলেন এবং এই চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্য রেখে গেছেন। দেবল হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি মৃন্ময়কে দিল।

মৃন্ময় আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। দেবল বিনা বাক্যব্যয়ে মৃন্ময়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার চিঠিখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, আছেন বেশ। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই কোন বড়লোক বন্ধু নেই। দেবল প্রস্থান করিল।

সুনির্ম্মলের বাড়ীতে হঠাৎ এমন কি উৎসব দেখা দিল যার জন্য এই সাদর আহ্বান! কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসরের কলিকাতা বাসকালে তাহাকে বহু বার সুনির্ম্মলের বাড়ী যাইতে হইয়াছে—যদিও সে তার গতিবিধি বহির্বাটী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। স্বেচ্ছায় কোন দিন সে কারুর বাড়ী যায় নাই। সুনির্ম্মলের বাড়ীতেও নয়। অতীতেও সে ডাকিয়াছে,

আজও আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। কিন্তু দুইয়ে তফাৎ অনেক। এ আহ্বান যুক্তি-বিচার দ্বারা এড়ান যাইবে না। দেখা না করিয়া চিঠি রাখিয়া যাওয়ার ইহা ছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে। বড় লোকের একমাত্র ছেলে। সবই ওর কেমন খাপছাড়া। মৃন্ময়ের সহিত কোথাও ওর এতটুকু মিল নাই। তথাপি সে তাহাকে এড়াইতে পারে না। পরীক্ষার ওজহাতে এবারে পূজায় বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত বাতিল করিয়া দিয়াছে। মাতার সকরুণ আহ্বান, মঞ্জুষার স্পষ্ট মিনতি সে খণ্ডন করিয়াছে। মঞ্জুষা ত সেই হইতে চিঠি লেখাই বন্ধ করিয়াছে। অথচ সুনির্ম্মল আসিয়া সেই মহামূল্য সময়ের উপর যখন তখন ভাগ বসাইতেছে। তাড়াইলেও যাইবে না। কটূক্তি করিলে মুখ টিপিয়া হাসে। ইহাকে লইয়া সে কি করিতে পারে।

খাবার তাগিদ আসিয়াছে। মৃন্ময়কে উঠিতে হইল।

৭

পরদিন বেলা চারিটা নাগাদ সুনির্ম্মলের মোটর আসিয়া হোষ্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। ড্রাইভারকে সরাসরি ফেরত পাঠাইতে পারিলেই সে খুশী হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হইল না। তাহাকে যাইতে হইল। ড্রাইভার মৃন্ময়কে সুনির্ম্মলদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। তাহাকে রীতিমত ব্যস্ত মনে হইল।

সুনির্ম্মলের সাক্ষাৎ বাহির মহলেই পাওয়া গেল। একমুখ হাসিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিল, কহিল, এসেছ তা হলে?

মৃন্ময় জবাব দিল, কাল দেখা না করে ওভাবে একটা চিঠি রেখে এলে কেন?

সুনির্ম্মল হাসিয়া কহিল, কারণ তোমার সঙ্গে বসে তর্ক করবার সময় কাল আমার হাতে ছিল না।

মৃন্ময় মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া কহিল, ও···কিন্তু এই জরুরী তলবের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

সুনির্ম্মল কহিল, জিজ্ঞেস তুমি যথাস্থানেই করো। আজকের নিমন্ত্রণ আমার নয়, আমার বোন রুবির। তার আজ জন্মদিন।

মৃন্ময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, এ ভাবে আমায় অপ্রস্তুত করা তোমার উচিত হয় নি সুনির্ম্মল। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হলেও—এই সব সামাজিক ব্যাপারে—ছি ছি সুনির্ম্মল, তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

সুনির্ম্মল কথাটা মানিয়া লইয়া কহিল, ও জিনিসটা আমার চিরদিনই একটু কম। কিন্তু আপাততঃ তুমি ওপরে যাও, আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি বেরিয়ে যাবে আর আমি···

সুনির্ম্মল কহিল, তাতে কিছু অসুবিধা তোমার হবে না। রুবি রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবীরা রয়েছেন। দেখতে দেখতে আমিও এসে পড়বো।

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, তার চেয়ে আমি এখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

সুনির্ম্মল কহিল, সেটা তোমার ইচ্ছে—অবশ্য রুবির যদি কোন আপত্তি না থাকে।

রুবি দেখা দিল। সুনির্ম্মল তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ইনিই মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য। তোমার অতিথি। আর এই আমার বোন রুবি। সুনির্ম্মল চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রুবি দুই করতল একত্র করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কথা দাদার মুখে আমি এত বেশী শুনেছি যে, আপনাকে আর অপরিচিত বলে ভাবতে পারছি না। বহু প্রশংসার সঙ্গে দাদা আপনার গানের প্রশংসা করতেও ভোলেন নি।

মৃন্ময় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, সুনির্ম্মল একটা আস্ত পাগল।

রুবি মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয় নিশ্চয়ই।

মৃন্ময় একথার জবাব দিল না।

রুবি কহিল, ভেতরে চলুন।

মৃন্ময় তাহাকে অনুসরণ করিল।…

…কে মৈত্রেয়ী…আয় ভাই। রুনু আসেনি বুঝি! কি হ'ল আবার তার। মৃন্ময়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া স্মিতহাস্যে কহিল, বসুন। মৃন্ময় বসিল।

রুবি মৈত্রেয়ীকে বসাইয়া নিজে তার পাশে বসিয়া অনর্গল বকিয়া চলিল, কি মেয়ে এই রুনু—অসুখ ওর লেগেই আছে। আজ মাথাধরা, কাল টন্‌সিল অপারেশন, পরশু জর জর ভাব। অছিলার আর অভাব নেই। রেণু ত ফোন করে দিয়েই খালাস, বলে, মার শরীর খারাপ। মাদের আবার শরীর ভাল থাকে কবে। কার কথা বলছ…লিলিদির—দাদা নিজেই গেছেন আনতে। এসে পড়বে এখুনি। কিন্তু রুনু এলো না, গাইবে কে?

মৈত্রেয়ীর প্রশ্নে মৃদু কণ্ঠে রুবি কহিল, দাদার বন্ধু। এ ভেরি গুড্‌ স্কলার। উহাদের কথা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। রুবির বান্ধবীর দল আসিতে সুরু করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল রুনু এবং রেণুও আসিয়াছে।

রুবি কহিল, কি ভাগ্যি, আজ বহালতবিয়তে আছ রুনু।

রুনু কহিল, ভাল আর কোথায় রুবি-দি, সর্দ্দি-কাশি লেগেই আছে। গলায় কিছু নেই।

মীরা হেনার চোখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। প্রকাশ্যে কিছু কহিল না। কিন্তু রেণু আবার স্পষ্টবাদিনী, সে থামিল না, কহিল, কি ভাগ্যি গান শিখিনি, নইলে সর্দ্দি-কাশি কি আমাদেরই ছেড়ে কথা কইত!

ছবি মুখে কিছু না বলিলেও প্রকারান্তরে রেণুর কথায়ই সায় দিল। মৃন্ময় বলিয়া যে একটি পুরুষ মানুষ এখানে উপস্থিত আছে তাহা যেন উহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। মৃন্ময় গবাক্ষপথে বাহিরে দৃষ্টি রাখিয়া এদের রকমারি কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, আর সুনির্ম্মলের বিলম্বের জন্য মনে মনে অনুযোগ করিতেছিল।

এদের কথার ফাঁকে রুবি একবার মৃন্ময়ের নিকট হইতে ঘুরিয়া গেল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না মৃন্ময় বাবু। সামান্য দোষত্রুটিও ওরা ক্ষমা করবে না। তাই···যাক ঐ যে দাদাও এসে পড়েছে।

সুনির্ম্মল এতক্ষণে ফিরিল। সঙ্গে আছে লিলি। সকলের দৃষ্টি এক সঙ্গে তার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত স্বাস্থ্যহীন সে নয়। অটুট স্বাস্থ্য এবং যৌবন লাবণ্য তাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। মৃন্ময় বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। ততক্ষণে সুনির্ম্মল মৃন্ময়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মৃন্ময়ের এই বিমুগ্ধ ভাবটি সুনির্ম্মলের দৃষ্টি এড়াইল না। ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। লিলিকে কহিল, ইনি মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য। আমার বিশিষ্ট বন্ধু। লিলি স্নিগ্ধ হাসিয়া মৃন্ময়কে নমস্কার জানাইল।

লিলিকে দেখাইয়া পুনশ্চ সুনির্ম্মল কহিল, আর ইনি হচ্ছেন লিলি সান্যাল। এবারে বি-এ দেবেন।

লিলি মৃন্ময়ের পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল এবং মৃদু হাসিয়া সুনির্ম্মলকে কহিল, আপনাকে ত অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে, আমি বরং মৃন্ময় বাবুর সঙ্গেই ততক্ষণ গল্প করছি।

মেয়েদের মধ্যে বেশ একটা চাপা গুঞ্জন উঠিল। লিলি একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়াই ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইল। কিন্তু সব সময় তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামান লিলি পছন্দ করে না। সে অসঙ্কোচে মৃন্ময়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে বদ্ধপরিকর হইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি চুপ করে আছেন যে?

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, গল্প করার মত বিষয়বস্তু না থাকলে যা হয় আমার তার থেকে কিছু বেশী হয় নি। আপনি নিজেই বলুন না আমি মিথ্যে বলেছি কিনা?

লিলি সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

রুনু কহিল, লিলিদির সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

মীরা কহিল, নিছক অহঙ্কার—

রুনু আরও খানিকটা যোগ করিয়া দিল, তবু যদি না আমরা হাঁড়ির খবর জানতাম।

রেণু বাধা দিয়া কহিল, তা বলে লিলিদিকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

রুনু কহিল, রেণুর যে বেজায় টান দেখছি।

রেণু মৃদু শ্লেষ সহকারে কহিল, কথাটা মিথ্যে বলো নি রুনু।

আলোচনাটা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। রেণুকে ওরা ভয় করে। রেণুর মুখ বড় আলগা। সত্য কথা সোজা করিয়াই বলিতে সে ভালবাসে।

রেণু থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, অন্যায়টা লিলিদির নয়, এ হচ্ছে আমাদের জঘন্য ঈর্ষা। তাকে ছুঁতে পারি না বলেই নিন্দে করা। আর এই অন্যায় কাজে আমাদেরই আনন্দ হয় সবচেয়ে বেশী।

ইহাদের আলোচনার ধরণে রুবি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। রেণুকে মিনতি করিয়া কহিল, তুই থাম ত রেণু। অমন বড় বড় কথা আমরাও দু-চারটে জানি। রুবি তাহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিল।

রেণু নির্ব্বিকার ভাবে বলিয়া চলিল, শুধু জানা থাকলেই হয় না রুবি। সময় মত তা প্রকাশ করবার সাহস থাকাও দরকার।···রেণু হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্তু সহসা সীতার আবির্ভাবে সে থামিল। রুবি কহিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে সীতা ?

সীতা কহিল, ওদিকে। লিলিদির ব্লাউসের ডিজাইনটা বড় চমৎকার। একটা নক্সা তুলে নিলাম।

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

সীতা একটু অপ্রস্তুত হইল, কহিল, ঐ তো তোমাদের দোষ। যেটি মনোমত হবে না সেখানেই করবে ঠাট্টা। বিশ্বাস না হয় দেখে এস ডিজাইনটা।

কিন্তু ডিজাইন দেখিতে যাইতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। আবহাওয়াটা যেন অকস্মাৎ ঝিমাইয়া পড়িল। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। সুনির্ম্মল আসিয়া পুনরায় হৈ চৈ সুরু করিয়া দিল—হোপলেস! এতটা সময় তোমরা শুধু গাল গল্পেই কাটিয়ে দিলে। না দেখছি একটা হারমোনিয়াম, না সেতার, না এস্রাজ। ওদিকেও দেখছি ওরা বেশ গল্প ফেঁদে বসেছে। দুটিই বুক-ওয়ার্ম। মিলেছে ভাল। যেমন মৃন্ময় তেমনি লিলি। এই যে রুনুও এসেছ! তা বলে রেণুকেও আজ ছেড়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু তার আগে যন্ত্রপাতিগুলো আনাতে হয়। সুনির্ম্মল অকারণে বিস্তর হৈ চৈ করিল।

রুনুকেই সর্ব্বপ্রথম গাহিতে হইল। ওর গলা বেশ মিষ্টি। টানিয়া টানিয়া গানকে শ্রুতিমধুর করিতে সে পাকা। মেয়েরা ওর বিশেষ ভক্ত কাজেই পর পর তাহাকেই বহুক্ষণ গাহিতে হইল। তার পর আসিল রেণুর পালা। স্বভাবত সে একটু গলা ছাড়িয়া গায়। অনাবশ্যক মাত্রাগুলিকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে না। গায় ভাল। কিন্তু ভক্তের অভাব। কাজেই আরম্ভেই তাহাকে শেষ করিতে হইল, এবং রুনুকেই পুনরায় গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। রুনু হয়ত গান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু মাঝখানে মৃন্ময় এক গোলযোগের সৃষ্টি করিল। কহিল, উনি ত' বেশ গাইছিলেন। ওঁকেই আবার গাইতে বলা হোক না।

রুনু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এক বার মৃন্ময়ের প্রতি চাহিয়া দেখিল। রেণু অতটা লক্ষ্য না করিয়াই পুনরায় সুরু করিল। কণ্ঠস্বর সুরের উপর নৃত্য করিয়া চলিল। মৃন্ময় একাগ্রভাবে শুনিতে লাগিল। অবশেষে রেণুকেও থামিতে হইল। রুনু পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়াও আর গাহিল না।

সুনির্ম্মল কহিল, রেণু এই অল্প কালের মধ্যে বেশ শিখেছ ত। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

রেণু লজ্জিত ভাবে মাথা নত করিল। রুনুর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তার কাছে সুনির্ম্মলের মতামতের একটা বিশেষ মূল্য আছে। সুনির্ম্মল পুনরায় বলিয়া চলিল, সেই বোবা রেণু, যে স্বরগ্রাম করতে পাঁচ বার ঢোক গিলেছে···জান মৃন্ময়, এরই নাম প্রতিভা। মানুষের মধ্যে যদি এ বস্তু থাকে সামান্য চর্চ্চা করলেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রেণুর মধ্যে লুকান ছিল সেই প্রতিভা।

রেণু হাসিয়া ফেলিল। কহিল, এর পরে কিন্তু সত্যিই লজ্জা পাব নির্ম্মল-দা।

সুনির্ম্মলও হাসিল, কহিল, তা বলে তোমায় আর গাইতে বলা হবে না রেণু। এ বারে গাইবেন লিলি। সকলেই একসঙ্গে তাহাকে সমর্থন করিল।

লিলি একটু হাসিয়া কহিল, গান আমি ভাল জানি নে, কিন্তু তা বলে কৃপণ নই। লিলির গানের পরে সুনির্ম্মল আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। মৃন্ময়ের একখানা হাত ধরিয়া কতকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে কহিল, মৃন্ময় ভট্টাচার্য্যকে তোমরা একজন কৃতী ছাত্র হিসাবেই জান, কিন্তু ভগবান যে ওকে দিতে কোন দিক থেকেই কার্পণ্য করেন নি, এবারে তা প্রমাণ হবে।

মৃন্ময় চাপা গলায় কহিল, পাগলামি করো না সুনির্ম্মল।

সুনির্ম্মল থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, ইনি এক জন ভাল গায়কও। তোমরা অনুমতি দিলে তোমাদের হয়ে আমি ওকে অনুরোধ করতে পারি।

একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয়। রুনুর গলার আওয়াজ সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময় স্মিত হাস্যে কহিল, সুনির্ম্মলের বাড়িয়ে বলা স্বভাব। নইলে আপনারাই বলুনত কলেজ হোষ্টেলে কি আর সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্ভব হয়। তা ছাড়া আপনাদের ঐ অরগ্যানে গাইবার তেমন অভ্যাস আমার নেই।

সুনির্ম্মল কি বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে থামাইয়া দিয়া রুনু কহিল, আমরা কিন্তু কালোয়াতী শুনতে চাইছি না।

কথা কয়টির অন্তর্নিহিত খোঁচাটি মৃন্ময়কে বিঁধিল, কিন্তু সে হাসিমুখেই জবাব দিল, আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন। এখানে যে বাঁয়া তবলা নিয়ে গানের কসরৎ চলছে না সে ত আমি দেখতেই পাচ্ছি।

লিলি রেণুর বাহুমূলে ঈষৎ চাপ দিয়া কহিল, সব কথা সকল সময় বলা চলে না। বলা উচিতও নয়। এ কথাটা বুঝবার মত বয়েস এবং বুদ্ধি তোমার নিশ্চয় হয়েছে রেণু।

রেণু একটু লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, আমি কিন্তু কিছু ভেবে বলি নি লিলি-দি।

লিলি হাসিল, কহিল, ভেবে এ কথা কেউ প্রকাশ করে না তা আমি জানি। উভয়ে হাসিয়া ফেলিল।

রুবি জানাইল, আহার্য্য প্রস্তুত।

৮

মৃন্ময় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিল যে, এই তুই ঘণ্টায় সে তুটি ছত্রও পড়ে নাই। লিলি, রুনু, রুবি ও মীরার মাঝে যেন খানিকটা একাগ্রতা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ওদের শাড়ীর ঝলমলানি, ভাষার সুতীব্র ব্যঞ্জনা, চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ···এর সবকিছুই চোখের সম্মুখে একটা মায়াজাল বিস্তার করে। সুনির্ম্মলের সুসজ্জিত হল-ঘরের সারি সারি বৈদ্যুতিক আলোর চোখ ঝলসানো দ্যুতির পাশে ওরা যেন এক একটি বিদ্যুৎ-ঝলক। মঞ্জুষার সহিত কোথাও এদের একতিল মিল নাই। মঞ্জুষার শান্ত শ্যাম মুখশ্রী, তার লাজনম্র চোখের অকপট দৃষ্টিভঙ্গী মৃন্ময়ের বুকে কোন দিন ঝড় তোলে নাই, কিন্তু একথা সে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে যে, মঞ্জুষা তার প্রশান্ত বুকের মাঝে নিঃশব্দে ভাসিয়া

বেড়াইতেছে। কোন আলোড়ন নাই, ঝঞ্ঝা নাই; নিঃসঙ্কোচ, নিরুপদ্রব এবং নিঃশব্দ।

মৃন্ময়ের আজ হঠাৎ নিজেকে এ ভাবে যাচাই করিবার বাসনা জাগিল কেন? নিজের অজ্ঞাতেই উহাদের প্রতি হয়তো তাহার খানিকটা দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছে। মৃন্ময় সচেতন হইয়া উঠিল। কিসের জন্য এ সব অনাবশ্যক যুক্তি। এ কেমন তার মনের বিলাসিতা! মৃন্ময় নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে, এদের নিজস্ব বলিতে আছে কি? এদের চালচলন কথা বলার ভঙ্গী—সবকিছুর মধ্যেই একটা প্রাণহীন উগ্র বৈশিষ্ট্য আছে। চমকপ্রদ—কিন্তু অসার। ওদের মনের খবর সে রাখে না, কিন্তু বাইরের যা, তা মনকে মাতাল করিতে পারিলেও একান্ত ভাবে কাছে টানিতে পারে না। ওরা ক্ষণপ্রভা, মুহূর্ত্তের আনন্দ। ওদের সঙ্গে লইয়া মোটরে হাওয়া খাইতে যাওয়া চলে। পাশে বসাইয়া সিনেমা দেখা যাইতে পারে। টেনিসের পার্টনার করিলেও চমৎকার মানানসই হয়, কিন্তু পল্লীর নিভৃত কোণে একটি শান্ত সুন্দর সংসার রচনা করা সম্ভব নয়। ওরা সব ঝড়ের মত হাওয়া, গ্রাম্য পর্ণকুটির ওদের জন্য নয়।

সহসা মৃন্ময় আপন-মনেই হাসিয়া উঠিল। এ এক আচ্ছা পরিহাস বটে—যেন উহাদের কেহ তার সহিত সংসার রচনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে—যেন তার জীবনের সহিত জড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে। মৃন্ময় ইংরেজী বইয়ের খানকয়েক পাতা পর পর উল্টাইয়া গেল, কিন্তু তার চিন্তার ধারা অপরিবর্ত্তিত রহিল।

উহাদের মধ্যে লিলির গতিবিধি বেশ সংযত। কথাও কম বলে। ওর ধরণ-ধারণ আলাদা। এই উগ্র পরিবেশের ভিতর হইতেও সুনির্ম্মল নির্ব্বাচনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

অকস্মাৎ মৃন্ময় বই বন্ধ করিয়া রাখিল।

মঞ্জুষার বাবাও রীতিমত ধনী। কিন্তু অর্থের উৎকট তীব্র প্রকাশ কোথাও নাই। বিস্ময় সৃষ্টির অবকাশ তারা দেয় না। যেন সাধারণের এক জন। এক মুহূর্ত্তে মৃন্ময়ের মনটা পদ্মাপাড়ের একখানি শ্যামল পল্লীর পথে ধাবিত হইল। ওখানকার সবই যেন তার চেনা—তার বড় আপন জন। তার জীবনের প্রতিটি ধাপে জড়াইয়া আছে। ওখানে তাকে সঙ্কুচিত হইতে হয় না। দারিদ্র্যের জন্য কুণ্ঠা দেখা দেয় না। ওখানকার পাখীর গান, নদীর কলতান, জেলেদের জাল ফেলা, নক্ষত্র খচিত আকাশ, পরপারের বৃক্ষশ্রেণীর সুনীল ছায়ারূপ, হিরু নাপিতের কুঁড়েঘর, রাধু বোষ্টমের রামপ্রসাদী সুর, মঞ্জুষাদের তিন মহল বাড়ী—সব যেন গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। একের সঙ্গে অপরের যেন নাড়ীর সম্বন্ধ রহিয়াছে।

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অসংখ্য স্মৃতি তার মনকে ঘিরিয়া আছে। তাহার মনে হইল যেন সে নদীর তীরে শ্যাম দুর্ব্বাদলের উপর দেহ বিছাইয়া মঞ্জুষার কোলে মাথা রাখিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকের জগৎসংসার যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষার একখানি কোমল হাত শিথিলভাবে তার কপালে ন্যস্ত, আর তার কয়েক গুচ্ছ চুর্ণ কুন্তল বাতাসে উড়িয়া আসিয়া মৃন্ময়ের চোখে মুখে মৃদু পরশ বুলাইয়া দিতেছে। বুকে তার কত কথা—যা ভাষার অজস্রতায় গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে। কে আছে তার সাক্ষী। ঊর্দ্ধে উদার-গম্ভীর নীলাকাশ আর নিম্নে পদ্মার খরস্রোত, যাহা অনাদিকাল ধরিয়া কত সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া চলিবে। কত দিনের এমনি কত মধুর স্মৃতি তার বুকের তলায় ঘুমাইয়া আছে। জীবনের ঐ দিনগুলি তার কাছে অমূল্য। তার মন-মঞ্জুষায় অক্ষয় সম্পদ।

সুনির্ম্মলের গলার সাড়া পাওয়া গেল, মৃন্ময় আছ? ঘরে পা দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, আঃ! ড্রেডফুল। এই বিকেল বেলাও বই নিয়ে বসে আছ!

মৃন্ময় চোখ তুলিয়া চাহিল। কোন কথা কহিল না।

সুনির্ম্মল পুনরায় কহিল, মেয়েদের কল্পনাশক্তি দেখছি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।

বিস্মিত কণ্ঠে মৃন্ময় বলিল, অর্থাৎ···

সুনির্ম্মল সহাস্যে কহিল, লিলি তোমায় ঠিক চিনেছে। সে বলে, বাহিরমুখো প্রাণী নাকি দেখলেই চেনা যায়। অর্থাৎ তোমার গ্রন্থকীটত্ব সম্বন্ধে সে একটা ধারণা করে নিয়েছে। সুনির্ম্মল হো হো করিয়া খানিক হাসিল। কিন্তু তাহাতে মৃন্ময়ের বিস্ময় কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। সে একটু বাঁকা উত্তর দিল, আমার সম্বন্ধে এই ধরণের আলোচনা ত স্বাভাবিক এবং সুস্থ নয় সুনির্ম্মল। তা ছাড়া আমার সম্বন্ধে তিনি কতটুকু জানেন! কতক্ষণের পরিচয় আমার সঙ্গে তাঁর!

মৃন্ময়ের উক্তির তীক্ষ্ণতায় সুনির্ম্মল সুর পাল্টাইল। কহিল, ভাবটা লিলির হলেও ভাষাটা আমার। কিন্তু তোমার কূট তর্ক থামাও। সত্যি কথা বলতে কি মৃন্ময়, তোমার আইন পড়া উচিত ছিল। সে যাই হোক, এখন এসব বাজে কথা রেখে চলো যাই খানিক বেড়িয়ে আসবে।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, সে রকম ত কোন কথা ছিল না সুনির্ম্মল।

সুনির্ম্মল কহিল, লিলি অবশ্য বলেছিল—বেড়াবার সময় হয়তো তোমার হবে না। কিন্তু আমি যে ওদের কথা দিয়ে ফেলেছি মিনু।

মৃন্ময় ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আমার সম্বন্ধে লিলি দেবীর এই ধরণের মতামত প্রকাশ করা যেমন নিরর্থক তোমারও তেমনি কথা দেওয়া

অনাবশ্যক। আর তা ছাড়া ওরাই বা কারা যাদের কাছে তোমার কথা রাখতে না পারাটা একটা মস্ত বড় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সুনির্ম্মল রাগত কণ্ঠে কহিল, খামোকা তর্ক করে একটা সীন ক্রীয়েট করো না মৃন্ময়। রুনু, রেণু, রুবি-সব তোমার জন্যে মোটরে অপেক্ষা করছে। এর পরে তারা এসে উপস্থিত হলেই কি খুব ভাল হবে ?

মৃন্ময় হাসিল। কহিল, তাঁরা যে এখানে আসবেন না বা আসতে পারেন না একথা তুমিও জান, কিন্তু আমি ভাবছি তুমি কি ভেবে ওদের এই হোষ্টেল পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছ! আশ্চর্য্য···তোমার কি একটা সাধারণ মানসম্মান জ্ঞানও নেই!

সুনির্ম্মল উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, না নেই। কিন্তু তুমি কি করবে তাই জানতে চাই।

হাসিমুখে মৃন্ময় কহিল, সে কথা কি আমায় বলে দিতে হবে। আমার হয়ে তুমিই বরং তাঁদের কাছে একবার ক্ষমা চেয়ো, কিন্তু তুমি আর দেরি করো না। তাঁরা সব অপেক্ষা করছেন।

সুনির্ম্মল চলিয়া যাইতেই মৃন্ময়কে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে মঞ্জুষার একখানি ছোট ফটো পাইয়াছিল, উহা অপহৃত হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা সুনির্ম্মলের কাজ। টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া সে কথা কহিতেছিল। মৃন্ময় একটু চিন্তিত হইল। সুনির্ম্মলের ঢাক পেটানো স্বভাব। অবশ্য মৃন্ময়ের ইহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। কিন্তু বেচারী মঞ্জুষা হয়তো ওর জানিত মহলে মুখে মুখে আলোচিত হইবে। উহাদের প্রগতিশীল সমাজের আবেষ্টনী হয়তো তাহাকে অকারণে রূঢ় আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ওদের এই অতি আধুনিকতার সহিত তার খাপ খায় না। তার নিজস্ব একটা নীতি ও মত আছে—যার ব্যতিক্রম সে পছন্দ করে না।

মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল। আজ এই মুহূর্ত্তে আর পুস্তকে মনোনিবেশ করা সম্ভব হইবে না, বরং কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিবার প্রয়োজন সে বোধ করিল। হোষ্টেলের এই দেয়ালঘেরা অপরিসর ঘরখানি তার নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে।

মৃন্ময় রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছে। অগণিত জনস্রোত। একটা প্রাণহীন জাতির নিঃশব্দ পথ-চলা। কারুর মুখে বলিষ্ঠ হাসি নাই। চলমান জনতার নিষ্প্রাণ মিছিল। মৃন্ময় চলিয়াছে। কোথায় কোন ভিখারী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সকরুণ আবেদন জানাইতেছে, সিনেমা বুকিং আপিসে কি পরিমাণ ভিড় জমিয়াছে, হেদোর জলে কে আজ ক্রমাগত তুই দিন ধরিয়া একাদিক্রমে সাঁতার কাটিতেছে—এসব খবর জানিতে তার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। তার চেয়ে পল্লীতে পল্লীতে এবার ধানের ছড়াছড়ি···পদ্মা এবার শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; গ্রামের তুঃখতুর্দ্দশা নাই···তাদের মুখে চোখে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়াছে—এ খবর যদি কেহ তাহাকে দেয় মৃন্ময় তাকে খুশিমনে একপেট খাওয়াইয়া দিবে।

মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল, কে···অবিনাশ? বড্ড চমকে উঠেছিলাম। ডাকলে কেন? সাজেস্‌শান চাইছ? হোষ্টেলে যেও। সব কি আর মনে ক'রে বসে আছি। কি বলছ? রেকর্ড ব্রেক করেছে···প্রফুল্ল ঘোষ? তাতে আমার কি। বলতে পার বেকার সমস্যার কোন সমাধানের পথ বেরিয়েছে কিনা? হ্যা হ্যা অন্নচিন্তার সমাধান। কি বলছ? বাঙালী ছেলেরা শুধু স্বপ্ন দেখতে জানে কাজ করতে জানে না! মিথ্যে কথা। আর এই হীন মিথ্যাই বাঙালীকে তাদের সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবনে দিন দিন তুর্ব্বল করে ফেলছে। তাদের আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে। না-না অবিনাশ তুমি হেসো না। সত্যিই আমি বাজে কথা বলছি না। কি বলছ কাল যাবে? যেও।

মৃন্ময় দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু পুনরায় তাহাকে থামিতে হইল কাঁধের উপর একখানা ভারী হাতের চাপে। সে কি! এবার বাড়ী যাবে না নিশা। পূজোর আর কতোই বা বাকী। পূজোর বাজার করতে বেরিয়েছ? কালই যাচ্ছ তা হলে। কিন্তু আমায় আবার টানছ কেন। বউয়ের জন্যে কাপড় কিনবে?...আ হা হা কে বলছে তোমায় খালি হাতে যেতে।...করছ কি আজকাল? চাকরীর চেষ্টা! বাবার পয়সায় জমিদারী...খানকয়েক বেশী করে নিয়ে যেও বন্ধু!

মৃন্ময় দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। আঃ জোর বাঁচিয়া গিয়াছে। অন্যমনস্ক হইবার যো আছে কি। যান্ত্রিক যুগ এটা। যন্ত্রের নব নব আবিষ্কার মানুষের নিরুপদ্রব জীবনে এক বিষম আতঙ্ক। কখন কার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। মোটর, বাস, লরি, স্থলপথে চলমান দুর্গ, জলে ভাসমান দুর্গ, উভচর দুর্গ, আরও কত কি। মৃন্ময় অন্যমনস্কভাবে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়াছে। আর খানিক পরেই গড়ের মাঠ। ওখানে গিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লইলে মন্দ হয় না। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির এ অঞ্চলের উপর বিশেষ দৃষ্টি আছে। আবর্জ্জনা জমিতে দেয় না। মৃন্ময় মনুমেণ্টের তলায় আসিয়া বসিল। কতকগুলি ছেলেমেয়ে আয়ার সঙ্গে বেড়াইতেছে। দিব্যি স্বাস্থ্য। দেখিতে ভাল লাগে। কত সাহেব মেম বেড়াইতেছে। প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছে। আনন্দের নির্ঝর যেন। মৃন্ময় ভাবে উহাদের কি কোন অভাব নাই, অথবা কোন দুঃখ। জীবনটাকে এরাই উপভোগ করিয়া লইতেছে। এরা পরদেশে আসিয়াও স্বাধীন, আমরা নিজের দেশেও পরাধীন। প্রাণ ভরিয়া একটু হাসিতে পারি না, মন খুলিয়া দুইটা কথা বলিতে পারি না। আমরা নিজেদের ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের দাবি তাই আজ আত্মকলহের ইন্ধন যোগায়। সত্য দাবি মিথ্যার কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। আলো নাই...শুধু অন্ধকার... নীরন্ধ্র অন্ধকার।

মৃন্ময়কে আজ কি ভূতে পাইয়াছে? সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। আজ এই সব এলোমেলো ভাবনা তাহার মনকে নাড়া দিয়াছে কিসের জন্য! অকস্মাৎ সে সুনির্ম্মলকে এর জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিয়া পুনরায় হোষ্টেলের পথে পা বাড়াইল।

পরদিন বৈকালে।

আজও সুনির্ম্মলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মৃন্ময়ের বাক্স-পেটরার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। জিনিষপত্র সব বাঁধাছাঁদা হইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় ঢাকা মেলে আজ রাত্রেই দেশে রওনা হইবে। অথচ গতকালও ঠিক ছিল পূজার অবকাশটা সে এখানেই থাকিবে। সুনির্ম্মল ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। বড় দেরি হইয়া যাইবে। তার এমন সাজান প্ল্যানটা শেষ পর্যন্ত না বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তার জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক দুষ্কৃতির কাহিনী অঙ্কিত হইয়া আছে, অর্থ এবং মিথ্যার গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া লক্ষ্যহারা ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। সুনির্ম্মল আজিও ভদ্র-সমাজে দিব্যি নিরুপদ্রবে মাথা উঁচু করিয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়াছে লিলিকে লইয়া। তার জীবনে লিলি ফুরাইয়া গিয়াছে তাই সে আজ মুক্তি চায়। অথচ সহজ পথ নাই। লিলি চালাক মেয়ে। আইনের ঘরে সে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। সহজ পথে মুক্তি নাই বলিয়াই মৃন্ময় তার অন্তরঙ্গ। বন্ধুত্বের বন্ধনের মধ্যে সে তার মুক্তির সন্ধান করিতেছে।

লিলিকে সে ভয় করে। ঐ নির্ব্বাক গম্ভীর মেয়েটি যে কখন কি ভাবে চলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাদের মধ্যের সম্বন্ধটা অতি কৌশলে সে কিছুদিনের জন্য চাপা দিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু এই গোপনতার গ্রন্থি যে-কোন মুহূর্ত্তেই সে খুলিয়া ফেলিতে পারে। তখন হয়তো

নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে কোন পথই তার আর খোলা থাকিবে না। কিন্তু লিলির জীবন-পথে যদি মৃন্ময়কে আনিয়া দাঁড় করান যায় তাহা হইলে তার মুক্তির আশা নিতান্ত দুরাশা নয়। নিজের দুষ্কৃতির বোঝা অতি সহজে মৃন্ময়ের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ সুনির্ম্মলের চিন্তিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, অবাক হয়ে গেছ নাকি? হঠাৎ মনটা বেঁকে দাঁড়াল। এতদিনের অভ্যাস না গিয়ে আর করি কি। খামোকা বুড়ো মা বাবাকে দুঃখ দিয়ে লাভ নেই।

সুনির্ম্মল ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে হাসিয়া কহিল, সে ত নিশ্চয়। কিন্তু তোমার মত লোকের পড়াশুনার ক্ষতি করে কতখানি যে পূজার আনন্দ ভোগে আসবে সেই কথাই ভাবছি।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, পড়াশুনো দেশেও বেশ চলতে পারে। কিন্তু বেশী দিন আমি গ্রামে থাকব না। তা ছাড়া লিলির ইংরেজী পড়ানোর ভার যখন দিয়েছ তখন বেশী দেরী করা চলতেই পারে না। এই কথাটাই জানতে চাইছ ত?

সুনির্ম্মলের চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় কহিল, যদি শেষ পর্য্যন্ত কোন কারণে পিছিয়ে পড়ি তা হলেও তোমার ভাবনার কারণ নেই। লিলি তার পড়াশুনার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার বিশ্বাস।

সুনির্ম্মল পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠিল, তোমার ঐ দুমুখো কথাবার্ত্তা আমার ভাল মনে হয় না। যা বলবে তা পরিষ্কার করে বলাই তোমার উচিত।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, যদি পরিষ্কার করে বলাটাই তুমি পছন্দ কর সুনির্ম্মল, তা হলে আমি বলি এ অধমকে রেহাই দাও। তুমি অর্থশালী, ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তুমি এক জন প্রফেসার তার জন্য নিযুক্ত করতে পার। আমিও সময়ের অপব্যবহার থেকে রেহাই পাই।

সুনির্ম্মল তীব্র কণ্ঠে কহিল, তুমি পয়সা চাও এ কথা খোলাখুলি বললেই হ'ত।

মৃন্ময় কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি আজ সুস্থ নও। আজ তুমি যাও। আমি ফিরে এলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। বলিয়া, জোর করিয়া মৃন্ময় প্রসঙ্গটা চাপা দিল। সুনির্ম্মল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

৯

পরদিন যথাসময়ে মৃন্ময় দেশের মাটিতে পা দিল। রাত তখন ন'টা। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ নাই। শুধু এখানে-ওখানে দুটি-একটি তারকা দেখা যায় মাত্র। আশেপাশের বড় বড় গাছগুলি অন্ধকারে খানিকটা বর্ণভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধীরে ধীরে মৃন্ময় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নৌকার মাঝি জিনিষপত্র লইয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। রাত বেশী হয় নাই, কিন্তু এরই মধ্যে গ্রাম যেন ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু থাকিয়া থাকিয়া দুই-একটা বাদুড় খাদ্যান্বেষণে উড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই মৃন্ময় মানুষ হইয়াছে। রাতের এই ঘুমন্ত প্রাণময় জগতের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা।

এই মাটিতে পা দিতেই মন তাহার বিপুল আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে।

আরও খানিক অগ্রসর হইতেই একসঙ্গে বহুলোকের কণ্ঠস্বর মৃন্ময়ের কানে আসিল। সে ক্ষণকালের জন্য থামিল। প্রতিমার সাজ-পোশাক লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। কর্ম্মকারদের প্রতিমার রং দেওয়া হইতেছে।

মৃন্ময় পুনরায় চলিতে সুরু করিল। সম্মুখেই জমিদার-বাড়ী। বাড়ীময় একটা চাঞ্চল্যের আভাস যেন। দ্বিতলের বড় হল-ঘরে একসঙ্গে অনেকগুলি ছায়ামূর্ত্তি ঘোরাফেরা করিতেছে। মৃন্ময়ের কেমন সন্দেহ হইল। মঞ্জুবার মার অসুস্থতার সংবাদ সে জানিত। দ্বাররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিল। উহারা সকলে ভালই আছে।

আর একটি বাঁকের শেষেই মৃন্ময়দের বাড়ী। কিন্তু বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া কাহারও সাড়াশব্দ পাইল না. কেননা পূর্ব্বাহ্ণে সে কোন খবর দেয় নাই। তাহার আসিবার নিশ্চয়তা ছিল না বলিয়াই দেওয়া সম্ভব হয় নাই। গ্রামের আজকাল কি দুরবস্থাই না হইয়াছে। পূজা আসন্ন অথচ কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। মৃন্ময়ের নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পূজা-অর্চ্চনায় সেকালের মত উৎসাহ বর্ত্তমানে বড় একটা দেখা যায় না। কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই তখন সাড়া পড়িয়া যাইত। প্রতিমার গড়ন, তার মুখশ্রী, আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা লইয়া রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত। সেদিনের উৎসাহীর দল আজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের প্রতি কাহারও তেমন মমতা নাই।

ছেলেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া মা অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন। একমুখ হাসিয়া কহিলেন, তবে যে উনি

বলছিলেন তুই আসবি নে···এবং খবর না দিয়া আসিবার জন্য তিরস্কার করিতেও ভুলিলেন না।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, তোমায় মোটেই ভাবতে হবে না মা। ষ্টীমারে আমি পেট ভরে খেয়ে এসেছি।

মা কহিলেন, তোর যেমন কথা। পথে-ঘাটে আবার খাওয়া হয় নাকি। ঘরের ডাল ভাতও ভাল।

মৃন্ময় পুনরায় কি বলিতে যাইতেই মা বাধা দিয়া কহিলেন, তোকে আর বাজে বকতে হবে না। যা বলি তাই শোন। হাত মুখ ধুয়ে আমার কাছে বসবি আয়।

খড়ম পায়ে প্রতুলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কহিলেন, তোর চেহারাটা ত তেমন ভাল ঠেকছি না মিনু। কলকাতার জলবায়ু বুঝি সহ্য হচ্ছে না?

মা কহিলেন, পথ-ঘাটের কষ্টটাই কিছু কম মনে করছ তুমি? মৃন্ময়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। মুখ, হাত-পা ধুয়ে নে। পুকুরে যেতে হবে না. তোলা জল আছে। আর বাপু ঐ রাস্তা-ঘাটের কাপড়চোপড়গুলো বাইরেই ছেড়ে রাখিস। বার জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি। তোদের ত আর জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। কথা বলতে গেলেই তর্ক করবি, বলবি জাত মানি না। জাত না মানিস অসুখ বিসুখ তো মানতে হয়।

মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কোন জবাব দিল না। মা পুনরায় আপন মনেই বলিয়া চলিলেন; বোকা ছেলের কাণ্ডখানা দেখ তো। একটা খবর দিয়েও কি আসতে নেই। সকালবেলার অমন মাছটা···কিন্তু তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন। তুই ফিরে আসতে-আসতেই আমি সব গুছিয়ে নেব। ঘরে ডিম আছে—কৈ মাছ আছে।

মৃন্ময় চলিতে চলিতে শুনিতেছিল, মা বাবাকে বলিতেছেন, চেহারাটা ওর সত্যিই বড় খারাপ হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়ীতে কি কিছু খাওয়া জোটে! গোনাগুণতি সব কিছু—তাও আবার ঠাকুর-চাকরের হাতে প্রাণ। আর তেমনি হয়েছে মিনু। ছুটি-ছাটা পেলেই যদি ছুটে আসে, দুটো খাইয়ে দাইয়ে একটু মানুষ করে পাঠাতে পারি।

প্রতুল একটু হাসিয়া কহিলেন, ছুটি-ছাটা বছরে দশ বার পাওয়া যায় না।

মা কহিলেন, তা নাই বা পেলে লম্বা ছুটি। ছুটকো-ছাটকা তো প্রায়ই পায়। এই তো মঞ্জু বলছিল, মাসখানেক আগেও নাকি কি একটা পার্ব্বণ উপলক্ষে সাতদিনের ছুটি ছিল। পথের কষ্ট তো একটি দিন মাত্র। তা ছেলেও হয়েছে তেমনি।

প্রতুল প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বেগুন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন, মিনুকে ভেজে দিও। বেশী আর হাঙ্গামা এই রাত দুপুরে করো না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে।

প্রতুল চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাঁহাকে যাহোক-একটা ব্যবস্থার বিধি দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন তাঁহার অত সহজে মন উঠিল না।

মৃন্ময় ফিরিয়া আসিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, তোমার যত কাণ্ড মা। বললাম আমার খিদে নেই। ভরপেট ষ্টীমারে—

মা ধমক দিলেন, ওখানে একটা আসন পেতে চুপ করে বসে থাক্।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, শরীরটাও তেমন ভাল ঠেকছে না। দুটো ভাতে ভাত হলেই ভাল হ'ত।

মা কহিলেন, জ্বালাসনে মিনু। সেই ব্যবস্থাই হয়েছে।

মৃন্ময় সহসা প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল, আসবার পথে জমিদার-বাড়ীর দোতলায় অনেক লোকজন আর আলো জ্বলতে দেখে এলাম মা। মঞ্জুষার মা ভাল আছেন তো?

মা কহিলেন, মঞ্জু আজ বলছিল বটে ওরা কাল হাওয়া বদল করতে বেরিয়ে পড়বে। ওর মার ভাঙা শরীরটা কিছুতেই আর জোড়া লাগছে না।

মৃন্ময় কহিল, সামনে পূজো ফেলে এমন অসময়ে যে···

মা কহিলেন, প্রাণের চেয়ে তো আর বড় কিছু নেই বাবা—তা বলে মঞ্জুর বাবা এখুনি যাচ্ছেন না। তিনি যাবেন সেই কালীপূজোর পরে। সরকারমশাই আর ঠাকুর-চাকর সহ মঞ্জু তার মাকে নিয়ে যাচ্ছে। ভালোয় ভালোয় আরোগ্য হয়ে ফিরে আসেন তবে তো হয়।

মৃন্ময় কথা কহিল না। তাহার গ্রামে আসিবার আগ্রহের সুর কোথায় যেন কাটিয়া গেল।

মা পুনরায় কহিলেন, ভাবতেও কষ্ট হয়। নইলে এমন মাটির মানুষ —কোন দিক দিয়ে কোন অভাব নেই, অথচ তাঁর মনে শান্তি নেই। ছেলে যদি অশান্তির কারণ হয় তা সব মা বাপের পক্ষেই মর্ম্মান্তিক। কাল সকালে উঠেই একবার দেখা করে আসিস মিনু। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না।

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

মা পুনশ্চ কহিলেন, তুই আসবি নে শুনে মঞ্জুর মা দুঃখ করছিলেন। নিজের পেটের ছেলে পর হয়ে গেল—তাই পরকে নিয়েও তাঁর সোয়াস্তি নেই। বলেন, নাড়ির বাঁধন যখন ছেলেকেই আটকাতে পারেনি তখন মুখের কথার দাম আর কতটুকু।

মৃন্ময় মনে মনে হাসিল।

মা যেন আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, যেন মুখের কথার কোন দাম নেই।

মাতা-পুত্রের আলোচনাটা নিতান্ত একতরফা হওয়ায় এক সময় আপনিই তাহা থামিয়া গেল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙ্গিল। সকালবেলার মুক্ত বায়ু তার দেহমনকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। সে উঠিয়া পড়িল। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিতে হইবে এবং ফিরিবার পথে মঞ্জুষাদের বাড়ী হইয়া আসিবে। জমিদার-বাড়ীতে ভোর হয় আটটায়, সুতরাং ওখানে এখন যাওয়া চলে না।

রাস্তায় পা দিতেই ভূদেবের সহিত দেখা। নান্টুর ছোট ভাই ভূদেব। এই সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানেই সে যেন কিছু লম্বা আর রোগা হইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় কহিল, ভাল আছ ভূদেব ?

ভূদেব হাসিয়া কহিল, ভালই আছি মিনুদা। কিন্তু আপনি শুনছিলাম এবার আসবেন না। কাল রাত্রে পৌঁছুলেন বুঝি।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, কথাটা এরই মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু মন যে বাধা মানে না ভাই। উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। যেন মস্ত বড় একটা হাসির কথা হইয়াছে।

ভূদেব কহিল, বৌদি কালও বলছিলেন, দেখে নিস্ ভুতু, মিনু ঠাকুর-পো সময়মত নিশ্চয়ই আসবে। খবরটা তাকে দিতে হবে।

মৃন্ময় অন্য প্রসঙ্গে আসিল, গ্রামের আজকাল হাল-চাল কি ভূদেব। নূতন খবর কিছু আছে নাকি ?

ভূদেব কহিল, না নূতন খবর আর থাকবে কোত্থেকে।

মৃন্ময় একটু নিরাশ হইল, কহিল, খবর সব সময়ই থাকে ভূদেব। শুধু খুঁজে পেতে নিতে হয়। সে যাকগে, যাবে নাকি আমার সঙ্গে নদীর পাড়ে বেড়াতে?

ভূদেব কহিল, এইমাত্র আমি বেড়িয়েই ফিরছি।

মৃন্ময় আর কথা বাড়াইল না। একলাই পথ চলিল। রাস্তার পাশ হইতে এঁঠেল গাছের এক টুকরা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল। পথ চলিতে চলিতে দাঁতন করা যাইবে। নদীর তীর ধরিয়া আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া যাইতেই একটা বাঁকের মুখে রাধু বোষ্টমের সহিত মুখোমুখি দেখা। মৃন্ময় কহিল, কে, বোষ্টমদা না?

হাসিমুখে রাধু বোষ্টম কহিল, চিনতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি। উভয়ের গতি মন্থর হইল।

মৃন্ময় কহিল, না চেনার কথা নয় বোষ্টমদা, কিন্তু তোমার চোখ দুটো অমন লাল কেন?

রাধু সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বোকা লোকগুলো কি কোনো কালে হিসেব করে চলতে জানে দাঠাকুর। চেয়ে আছ কি, এই মাত্র শ্মশান থেকে ফিরছি। বাপ-খুড়ো, পাড়া-পড়শী মরদগুলো সব বোতল বোতল গিলে এসেছেন। গতি করবার বেলা এই রাধু বোষ্টম। কি করি বৌটা এসে কেঁদে পড়েছে।

মৃন্ময় বিস্ময় বোধ করিল। কহিল, তুমি কি সব উল্টাপাল্টা বকছ রাধুদা? কার আবার গতি করে এলে?

রাধু কহিল, চণ্ডে বাগ্দীর ছ'বছরের ছেলেটার। ঐ একটা মাত্র ছেলে। না পড়ল এক ফোঁটা ওষুধ, না পেলে একটু সেবা-শুশ্রূষা। বৌটা সকালে বেরুল গোঁসাইপাড়ায় ধান ভানতে। ছেলেকে রেখে গেল ঘর আগলাতে। ফিরে এসে দেখে ছেলেটা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। একেবারে আসল কলেরা। সন্ধ্যে নাগাদ সব ঠাণ্ডা। পাড়া-পড়শীরা সন্ধ্যার পর

কারখানা থেকে এলেন মত্ত অবস্থায়। কাল পেয়েছে হপ্তার মাইনে। তখন ওদের সামলাতেই লোকের দরকার। চণ্ডের বৌটা এসে কেঁদে পড়ল। কি করি বল!

মৃন্ময় বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। রাধু পুনরায় বলিয়া চলিল, চণ্ডের নেশা ছুটে গেলেও আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। কি অলক্ষুণে কারখানাই হ'ল, গ্রামকে শেষ না করে আর ও ক্ষান্ত হবে না। রাধু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, গিয়ে দেখি চণ্ডে তার মরা ছেলেটাকে বুকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

রাধু পুনরায় কহিল, কারখানা করেছিস্ বেশ করেছিস, কিন্তু তার মধ্যে মদের দোকান কেন!

মৃন্ময় বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, ওটা দরিদ্রকে দমিয়ে রাখবার পাকা বুনিয়াদ বোষ্টমদা। দেড়শ' বৎসর বিদেশী রাজত্বের করুণার দান।

রাধু বোষ্টম বারকয়েক মাথা নাড়িয়া কহিল, কথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদাঠাকুর। দোষটা সত্যি কাদের। রাজার জাতের না আমাদের নিজেদের। এ করুণার দান তোমরা মাথায় তুলে নিয়েছ কেন। ঝেড়ে ফেলবার শক্তি এবং সাহস যখন তোমাদের নেই তখন মিথ্যা দোষ দেওয়া আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করা একই কথা। রাধু বোষ্টম থামিল। তাহাকে যেন একটু উত্তেজিত মনে হইল।

মৃন্ময়ের বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। তার পরিচিত রাধু বোষ্টমকে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ক্ষেপাটে আত্মভোলা অর্দ্ধশিক্ষিত রাধু বোষ্টমের এ যেন আর এক রূপ। মৃন্ময় বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতে রাধু বোষ্টম পুনরায় কহিল, ছোট মুখে বড্ড বড় কথা হয়ে

গেল। কিন্তু কথাটা আমার নয়। ধার করা দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, তা হোক। কিন্তু বড় খাঁটি কথা বলেছ তুমি বোষ্টমদা। সাহস এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির অভাবই আমাদের প্রতিপদে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর মুষ্টিমেয় জনকয়েক স্বার্থান্বেষী তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের পাকা ইমারত গড়ে তুলেছে।

মৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, তাদের সাবধান করে দিতে হবে যে, যাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে তোমাদের ইমারতের গাঁথুনি তৈরি করেছ তারা একদিন নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে উঠবে, যার প্রচণ্ড আলোড়নে কর্পূরের মত উবে যাবে তোমাদের ঐ নির্লজ্জ উৎপীড়নের উপায়গুলো।

রাধু বোষ্টম সহসা হাসিয়া উঠিল। কহিল, এ যেন শূন্যে হাত-পা ছুড়ে বীরত্ব দেখানো দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় অত্যন্ত লজ্জা পাইল। রাধু সহসা অন্য কথা পাড়িল, আছ তো দিনকয়েক দাদাঠাকুর? সময় করে একবার যেয়ো। গোটাকয়েক কথা আছে। রাধু আর উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইল না। মাঠের পথে দ্রুত প্রস্থান করিল।

রোদ উঠিয়াছে। রাধু বোষ্টমের জন্য মৃন্ময়ের অনেকটা বিলম্ব ঘটিল। আজ আর বেড়ান হইবে না। তবুও তার জন্য সে একটুও দুঃখিত নয়। রাধুকে সে বরাবরই ভিন্ন চোখে দেখে। কিন্তু আজ ওর সম্বন্ধে তার মনে একটা কৌতূহল জাগিল। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতেছিল। তেওয়ারীর কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই তাহাকে থামিতে হইল। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই তেওয়ারী জানাইল যে, মঞ্জুষা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

মৃন্ময় কহিল তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম তেওয়ারী। চলো! একটু থামিয়া মৃন্ময় তেওয়ারীকে প্রশ্ন করিল, আমি এসেছি এ খবর তোমাদের মঞ্জুদিদি পেলে কেমন করে?

তেওয়ারী গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসিল। প্রকাশ্যে কহিল, সে তাহা জানে না।

মৃন্ময় অকারণে খানিকটা খুশী হইল।

বাহির-মহলেই মঞ্জুষা অপেক্ষা করিতেছিল। মৃন্ময়কে সহাস্যে অভ্যর্থনা করিল, সু-প্রভাত মিনুদা। তোমার বেড়ানো হ'ল!

মৃন্ময় হাসিল. কোন উত্তর করিল না। তেওয়ারী সময় বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধটা এ বাড়ীর সকলেরই জানা।

মঞ্জুষা কহিল, আবার হাসছ কোন্ মুখে। সেই ভোর ছ'টায় এই পথ দিয়ে গেছ আর ফিরলে প্রায় সাড়ে আটটায়। তাও আমাকে ডেকে পাঠাতে হ'ল। নইলে এ বেলা হয়তো এখানে আসবার সময়ই হ'ত না তোমার।

চমৎকার অভিযোগ। কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা। তথাপি হাসি মুখেই মৃন্ময় জবাব দিল, সকালবেলার মিষ্টি রোদটুকুর মোহ আমার কম নয় মঞ্জু।

মঞ্জু কহিল, এ মোহ আবার কবে থেকে?

মৃন্ময় কহিল, যদি বলি আজ থেকে এবং তা তোমার আহ্বান পৌঁছুবার আগে পর্য্যন্ত তা হলে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে?

মঞ্জুষা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া কহিল, যার কথা এবং কাজে কোন মিল নেই তাকে কেমন করে বিশ্বাস করা যায় বল তো! মঞ্জুষা ক্ষণকালের জন্য থামিয়া পুনরায় কহিল, তোমার চিঠি পেয়ে আমার যা রাগ হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরেই আমার মন বলছিল তুমি আসবে। কিন্তু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি। ভেতরে চলো।

মৃন্ময় কহিল, তোমার মা কেমন আছেন ?

মঞ্জুষা কহিল, মাঝে বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, ইদানীং খানিকটা ভালই আছেন। তাই হাওয়া বদলের ব্যবস্থা হয়েছে। আজই যাবার কথা ছিল, কিন্তু ভোরবেলা উঠে বাবা মত বদলালেন।· পূজোটা সামনে রেখে যাওয়া হতে পারে না। অথচ এ প্রশ্ন আগেও উঠেছিল, কিন্তু বাবা কারুর কথায় কান দেন নি।

মৃন্ময় কহিল. বিদেশে যাবার জন্যে তুমি বুঝি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ ?

মঞ্জুষা কহিল, বরং তার উল্টো। কিন্তু আমার কেমন ভয় করে। বাবা হয়তো মার মৃত্যু আশঙ্কা করছেন।

মৃন্ময় কিছু বলিবার জন্যই হয়তো মুখ তুলিয়াছিল, সহসা জীবানন্দের গলার সাড়া পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ প্রশ্ন করিলেন, কে মিনু এসেছ নাকি !

মৃন্ময় নত হইয়া প্রণাম করিল। জীবানন্দ তার মাথায় হাত রাখিলেন। কহিলেন, প্রতুল বলছিল পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে এবার পূজোর সময় তুমি আসবে না। পড়াশুনোয় অবহেলা করতে বলছিনে, তা বলে পূজো-পার্ব্বনের সময় মা বাপের কাছে ফিরে আসতে হয় বৈকি। তাদের দিকটাও একবার ভেবে দেখা দরকার। জীবানন্দর কণ্ঠস্বর কেমন একটু ভারি ঠেকিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, তা ছাড়া দেশগাঁয়ে আসা-যাওয়াটা একবার বন্ধ হয়ে গেলে শেষ পর্য্যন্ত ঐটেই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নইলে গ্রামের আজ এ দুরবস্থা হবে কেন। তিনি থামিলেন।

মৃন্ময় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পিতার অলক্ষ্যে মঞ্জুষা একটু হাসিল। মৃন্ময়ের এই বিব্রত ভাবটিতে সে বেশ মজা পাইতেছিল।

এতকাল শহরে থাকিয়াও তার মিনুদা ঠিক তেমনি লাজুক রহিয়া গিয়াছে।

জীবানন্দ পুনশ্চ কহিলেন, ছুটি-ছাটা পেলেই মা-বাপের কাছে আসতে হয়। এগুলি বন্ধন। তিনি প্রস্থান করিলেন।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, ভারি ফাজিল হয়ে পড়েছ মঞ্জু।

মঞ্জুষার দু' চোখে আনন্দ উপছাইয়া পড়িতেছে। সে হাসিয়া কহিল, অবশ্য তোমার মত লাজুক হয়ে পড়িনি। আচ্ছা কি হলে আমায় খুব মানাত মিনুদা? লজ্জায় মুখ লাল করে ছুটে পালিয়ে গেলে, না আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকলে! মঞ্জুষা আর এক দফা হাসিয়া উঠিল।

মৃন্ময় প্রসঙ্গান্তরে যাইতে চায়। কহিল, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে।

মঞ্জু পথ চলিতে চলিতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, আধ ডজন চিঠি দিয়েছি, আর একটা চিঠিরও উত্তর দেওয়া তুমি দরকার মনে কর নি মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, তোমার চিঠি পাইনি বলেই হয়তো।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, উপস্থিত দায় এড়াবার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু নেই মিনুদা!

মৃন্ময় কহিল, তা হলে তুমি বলতে চাও যে, আমি তোমায় মিথ্যে বলেছি?

মঞ্জুষা কহিল, মিথ্যে বলতে আমারও বয়ে গেছে।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, কি লিখেছিলে অতগুলো চিঠিতে?

মঞ্জুষা প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে কহিল, চমৎকার প্রশ্ন তোমার। সব কথা আমি যেন মনে করে বসে আছি। যখন যা মনে এসেছে তাই লিখেছি।

মৃন্ময় কোন কথা কহিল না।

মঞ্জুষা থামিতে পারিল না। কহিল, আচ্ছা সে কথা শুনে তোমার কি লাভ হবে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সে কথা জেনেই বা তোমার কি হবে মঞ্জু।

মঞ্জুষা হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, তুমি বুঝি রাগ করেছ?

মৃন্ময়ও গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, রাগ করিনি, কিন্তু দুঃখ পেয়েছি তোমার স্মৃতিশক্তির অপহ্নব ঘটতে দেখে।

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল। ধমক দিয়া কহিল, আবার বাজে কথা।

মৃন্ময় হাসিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, অনেকটা এগিয়ে গেছ দেখছি। শাসন করতেও দিব্যি শিখেছ।

মঞ্জুষা হঠাৎ যেন একটু লজ্জা পাইয়াছে এমনি ভাবে কহিল, আমি যেন তাই বলেছি। না না, তুমি ভারি অসভ্য হয়েছ···ছি···মঞ্জুষা অকস্মাৎ অন্যত্র প্রস্থান করিল। মৃন্ময় মঞ্জুষার মায়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

মৃন্ময়কে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মঞ্জুষার মায়ের দুটি চোখ উজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে তাহাকে কাছে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন। কহিলেন, আমি জানি মিনু আমার তেমন ছেলে নয়। পূজো-আর্চার দিনে সে নিশ্চয় মায়ের কোলে ফিরে আসবে। মঞ্জুষার মা থামিলেন। অতর্কিতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখের কোণে দেখা দিল অশ্রু-রেখা। মৃন্ময় অকারণে অপরাধীর মত ভাব দেখাইয়া বসিয়া রহিল। বলিবার মত কোন কথাই তার মুখে যোগাইল না। মঞ্জুষার মা পুনরায় কহিলেন, মঞ্জু বলছিল এটা তোমার পরীক্ষার বছর। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে আসবে না। বোকা মেয়েটা শুধু পড়াশুনোর কথাটাই ভেবেছে, সেই সঙ্গে মা-বাপের কথাটা ভেবে দেখে নি। মা-বাপকে অসুখী রেখে কেউ কোন দিন বড় হতে পারে না।

দরজার পাশে মঞ্জুষা দেখা দিল। মা ডাকিলেন, তোর মিনুদা এসেছে মঞ্জু, ওর জন্য একটু খাবার দিয়ে যেতে বল মা।

মঞ্জুষা মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি জানি মা। খাবার এখুনি বামুন-মা দিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জুষার মা কহিলেন, আমি তখনই তোকে বলেছিলাম না, মিনু আমার তেমন ছেলে নয়। ও নিশ্চয় পূজোর দিনে আসবে।

ইহার পরে যে কোন্ কথা আসিবে এ খবর মঞ্জুষার জানা। সে ব্যস্ত ভাবে অন্য কথা পাড়িল। . ঐ দেখ মা কথায় কথায় কত বড় ভুল হয়ে গেছে। ন'টা বেজে গেল, তোমার ওষুধ দেওয়া হয়নি এখনও। কেষ্টর মাকে দিয়ে যদি একটা কাজ কোন দিন হয়।

মা হাসিয়া কহিলেন, কেষ্টর মা ত কোনোদিন আমায় ওষুধ দেয় না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, দেয় এ কথা আমিও বলছি নে মা। দিলেও তো পারে এক আধ দিন। জান মিনুদা, এ বাড়ীর চাকর-বাকরগুলো হয়েছে এক একটি খুদে বাদশা। এই যে বামুন-মাকে এক ঘণ্টা হ'ল খাবার দিয়ে যেতে বলেছি, এল এখনও। ফাঁকি দেবার সুযোগ পেলে এতটুকুও সে ছাড়ে না।

বামুন-মার আবির্ভাবে প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা পড়িলেও মঞ্জুষার অভিযোগের জের এইখানেই শেষ হইল না। পুনরায় অন্যপথে প্রকাশ পাইল। মঞ্জুষা মাকে পুনশ্চ কহিল, এই যে সরকার মশাই—যাকে নিয়ে আমরা বিদেশে যাবার আয়োজন করেছিলাম তার উপরও আমার এতটুকু আস্থা নেই। কাল ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ফরমাসমত সব জিনিস পত্র ঠিক করে রাখা হয়েছে ত?

মাথা চুলকে জানালেন, প্রায় সবই ঠিক আছে। তবে…এই তবের হিসেব নিতে গিয়ে দেখা গেল প্রায় সব কিছুই তখনও ঠিক হয় নি। কি ভাগ্যি এখন আমাদের যাওয়া হ'ল না।

ইহার পরে মঞ্জুষা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। মাকে ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁর গা ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, একটা কাজ করলে হয় না মা।

মঞ্জুষার মা এবং মৃন্ময় একসঙ্গে তার মুখের পানে চাহিলেন। মঞ্জুষা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, মিনুদাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না মা। ওর ত প্রায় দেড় মাসের ছুটি।

মায়ের মুখে হাসি দেখা গেল। মৃন্ময়ের চোখে বিস্ময়।

মা কহিলেন, গেলে তো ভালোই হ'ত, কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হবে মা, এত দিন পরে মিনু তার মা বাবার কাছে এসেছে।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু আমরা তো আর দু-চার দিনের মধ্যেই যাচ্ছি নে। মিনুদা তার মা-বাবার কাছে থাকবার সুযোগ তো পাচ্ছেনই।

মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, মিনুর সুবিধে-অসুবিধের কথাটাও একবার ভাবা দরকার মঞ্জু।

মৃন্ময় হয়ত কিছু বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে মুখ খুলিবার অবকাশমাত্র না দিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, মিনুদার সুবিধে-অসুবিধের কথা তোমায় ভাবতে হবে না মা, জ্যাঠাইমাকে ডেকে তুমি বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মায়ের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। কি ভাবিলেন তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কহিলেন, কথাটা মঞ্জু নেহাত মন্দ

বলে নি মিনু। আমাদের সঙ্গে দিনকয়েকের জন্য ঘুরে আসবে চল। তোমার মার অনুমতি আমি চেয়ে নেব।

মৃন্ময় কথা বলিবে কি! এই নির্লজ্জ মেয়েটির কাণ্ডকারখানা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সে না পারিল মুখ তুলিয়া চাহিতে, না পারিল একটা সহজ প্রতিবাদ করিতে এবং আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ হইল সে আসিয়াছে। এখন ফিরিতে হইবে। বেলা তখন দশটার কম নহে।

১০

দিনকয়েক পরে।

মৃন্ময় মঞ্জুষাকে কহিল, তুমি যে এমন ছেলেমানুষি করতে পার এ আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি। আমি অবাক হয়ে সেদিন তোমায় দেখছিলাম। তুমি কি পাগল মঞ্জু।

মঞ্জুষা প্রতিবাদ করিল, কহিল, এর মধ্যে আবার পাগলামি তুমি কোথায় দেখলে। বাবা আপাততঃ সঙ্গে যাবেন না সরকারের সঙ্গে যেতে আমার ভাল লাগে না।

মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, কিন্তু আমার তো আসবার কথা ছিল না মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি না এলে একথা আমায়ও বলতে হ'ত না। যখন এসেছ তখন আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি কেন? তোমায় সত্যি বলছি মিনুদা কতকগুলো বাজে অজুহাত দেখিয়ে আমায় দিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করিয়ো না।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, এ তোমার অন্যায় কথা। তা ছাড়া এর মধ্যে কেলেঙ্কারীর কি থাকতে পারে আমি বুঝে পাই না মঞ্জু। একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনরায় কহিল, সব কথা বাদ দিলেও আর সামান্য ক'টা মাসের ব্যবধানে আমার পরীক্ষা এ কথা ভুললে ত চলবে না। যত গুরুতর অভিযোগই তোমার থাক তার সঙ্গে আমার যাওয়া-না-যাওয়ার কি সম্পর্ক।

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু এ কথাও আমি বুঝি নে যে, দু-বছরের অভ্যাস দু-সপ্তাহের অনভ্যাসে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মৃন্ময় কহিল, তুমি শুধু দু-সপ্তাহের অনভ্যাসটার কথাই ভাবছ। মনের দিকটা দেখছ না।

মঞ্জুষা মৃন্ময়কে কেমন করিয়া বুঝাইবে তার মনের এক আশ্চর্য্য অনুভূতির কথা। তার জীবনে মৃন্ময়ের প্রয়োজন যত বড় হইয়া উঠিতেছে কোথা হইতে দুইখানা অদৃশ্য বাহু যেন তাকে সবলে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। মঞ্জুষা বিস্মিত হয়, চমকিত হয়। মৃন্ময়কে কাছে পাইয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহাকে-সাধ্যমত নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে চায়। মনকে সে ধমক দেয়, বলে এ তার ভাববিলাস। কিন্তু মনের এই কাল্পনিক ভীতি তাহাতে দূর হয় না।

মঞ্জুষার চিন্তিত মুখের প্রতি ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া মৃন্ময় পুনরায় কহিল, চুপ করে আছ যে।

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে কহিল, মনের দিকটা যে চোখে দেখা যায় না মিনুদা, না হলে এ অনুযোগ তুমিও আমায় দিতে না; দুঃখ পেতে। কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক, আমি বড় ক্লান্ত। মঞ্জুষা ম্লানমুখে প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, আর একটু বসবে না—

মঞ্জুষা উত্তর দিতে গিয়া থামিল। পিওন আসিয়াছে। চিঠি আছে। মৃন্ময়ের চিঠি—লিখিয়াছে নান্টু। শিরোনামায় হস্তাক্ষর দেখিয়াই মৃন্ময় আন্দাজ করিয়াছে। মঞ্জুষা মৃন্ময়ের পাশে ঘন হইয়া বসিল।

নান্টুর চিঠি :—

তোমাদের নান্টুর পুনর্জ্জন্ম হয়েছে। আজ যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছে সে তোমার পুর্ব্বপরিচিত নান্টু নয়। এক নূতন মানুষ নূতন চেতনা নিয়ে তোমাদের স্মরণ করছে। তাকে বিশ্বাস করো ভাই। পাহাড়ের সেই কাহিনীটি বোধ হয় আজও ভুলে যাও নি। মানুষের দুষ্কৃতির ছাপ এত সহজে মন থেকে মুছে যেতে পারে না। কথাটা আমি জানি। তাই বলছিলাম যে তোমাদের সে নান্টুর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এই নবজন্মে যে জীবন আমার আয়ত্তে এসেছে তা অমূল্য। সেই কথাই বলব।

গানে আমার দখল ছিল এ কথা তুমি জান। নদীর তীরে বসে কত দিন যে আমরা গলা মিলিয়ে গান করেছি মঞ্জুকে শ্রোতা করে সে কথা কি ভুলেছি মনে কর। যদিও অতীত আমার কাছে মৃত, কিন্তু আমি যেন জাতিস্মর হয়ে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেছি।

পাহাড় থেকে পালিয়ে গেলাম কলকাতায়। সহায়হীন, সম্পদহীন আমি। কে আমায় জানে, কে আমায় চেনে। আমার বিদ্যার দৌড় তোমার অজানা নয়। পাহাড়ের অবাঙ্গালীর মধ্যে নিজেকে কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারলেও আমার জাতভাইদের কাছে আমার কোন মূল্যই নেই। দৈনিক তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পরিবর্ত্তেও কেউ দশটি টাকা দিতে প্রস্তুত নয়। আমার যথার্থ মূল্য এরা চোখের পলকে বুঝে নিয়েছে—এখানে ফাঁকি চলবে না।

আবার বেরিয়ে পড়লাম। যদি না খেতে পেয়ে রাস্তায় শুকিয়ে মরতে হয় তবে অপরিচিত স্থানে গিয়ে মরাই ভাল। তবু নিজকে শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা দিতে পারব। কেউ আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে না, হতভাগাটা না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মরেছে।

রেল-কোম্পানীকে কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্ণৌ গিয়ে পৌঁছলাম। বেঁচে থাকবার মত একটা আশ্রয় পেলাম ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের বাড়ীতে। আমার ভিক্ষুকের বেশ সেই দিনই ত্যাগ করতে হ'ল। আপত্তি করি নি, এর প্রয়োজন হয়তো আমার শেষ হয়েছে। কিন্তু নষ্ট করি নি, আজও সুটকেশে তা সযত্নে রেখে দিয়েছি।

অল্প কিছুদিনেই খানিকটা সুবিধা করে নিয়েছি। মিঃ সেন কেন জানি না খুব খুশী হতে পারেন নি। যদিও পিঠ চাপড়ে বলেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার এই চেষ্টাকে আমি সাধুবাদ দিচ্ছি, কিন্তু বিপদ-আপদ মানুষমাত্রেরই আছে। প্রয়োজনের দিনে স্মরণ করো। ভদ্রলোক সত্যই সজ্জন।

এখানকার সঙ্গীত-কলেজে ভর্তি হলাম। জীবনে কোন কিছুই করি নি। নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকবার মত একটা অবলম্বন ত আমার চাই।

এখানে অল্পেই বেশ একটু নাম হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নয়। ছোট-খাট পার্টি থেকেও প্রায়ই ডাক আসছে। এক কথায় বেশ আছি। অকস্মাৎ মনে পড়ল তোমাকে। দুঃখের দিনে আত্মগ্লানিতে যখন আমি একেবারে বোবা হয়ে বেঁচে ছিলাম সে দিনেও তোমাদের জন্য মন আমার কেঁদে উঠত। আজও তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নি।

কিছুদিন ধরেই অতীতের দিনগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। কি ছিলাম—কোথায় এসেছি, অদৃষ্ট আবার কোন্ পথে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এ আমার উচ্ছ্বাস নয়, অথবা জীবন-দর্শন নিয়ে বক্তৃতাও দিচ্ছি না। বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করতে গিয়েই একথাটি বারবার মনে পড়ছে। মানুষের চাওয়ার যেমন শেষ নেই, সুযোগেরও তেমনি অন্ত নেই। শুধু চিনে নেবার অপেক্ষা—আঁকড়ে ধরবার ইচ্ছাশক্তি।

এখানে এক বিদেশী ভাই এবং বোনকে পেয়েছি। তাদের বাঙালী বললেও ভুল বলা হয় না যদিও তারা তা নয়। আমাদের সম্পর্কটা কেউ বিশ্বাস করে. কেউ করেও না। কিন্তু আমার আর তাতে ভয় নাই। নিজের সম্বন্ধে আজকাল আমি অত্যন্ত সচেতন। মন আর মুখের মধ্যে একটা সম্মানজনক ব্যবধান রেখে কথা বলি, তাতে আর যাই হোক কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় না। আমার উপর ওদের অগাধ বিশ্বাস, নির্ভরতার অন্ত নেই। লোকমুখে শোনা যায় দাদা নাকি তার বোনটির ভার আমার উপর দিয়ে কয়েক মাসের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেবেন। এটা গুজব, কিন্তু এই গুজব যদি সত্যি হয় তবে আমাকে আরও সংযত হতে হবে। মানুষের বিশ্বাসের মূল্য আজকাল কতকটা দিতে শিখেছি। তা ছাড়া তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই—দোষও দেখি নে। একটা কথা কি জান? রক্তের যেখানে সম্বন্ধ নেই সেখানে ভাই বোন সম্বন্ধটা মধুর হলেও নিরাপদ নয়। সেখানে ভয় আছে এবং বিচিত্র সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এসব আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তার দাদা সত্যি সত্যিই এখুনি যাচ্ছেন না। ওদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানাবার আছে। বারান্তরে লিখব। শুধু মেয়েটির নামটা তোমায় জানিয়ে রাখছি। ওকে লীলা রাও বলেই মনে রেখো। বড় ভাল মেয়ে। ভাল

কথা—আমাদের মঞ্জুর খবর কি? এত দিনে বোধ হয় অনেকটা বড় হয়েছে। ওকে আমার স্নেহ দিও। এখানে নানা জনের ভিড়ের মাঝেও ওকে সব সময় মনে পড়ে। কত বাজে চিন্তা এসে মনকে নাড়া দেয়। অসম্ভব কল্পনা···তাই নিজেকে শাসন করি। চিঠির উত্তর পেলে খুশী হব।

নান্টু

মঞ্জুষা কহিল, নান্টুদা কিন্তু বিনিয়ে বিনিয়ে বেশ লিখতে পারে। কবি-মানুষ!

মৃন্ময় কহিল, নান্টু বেশ আছে। এক কথায় যাকে বলে ভ্রাম্যমান জীবন। আজ এখানে, কাল ওখানে। গতি ওর কোথাও রুদ্ধ হয় না। ওকে আমি একতিল বিশ্বাস করি না। কালই হয়তো আর এক চিঠিতে লিখবে, চললাম বন্ধু লক্ষ্নৌ ছেড়ে পেশোয়ার। এমনি ছন্নছাড়া ওর স্বভাব। ওর জীবনের এইটেই হল স্বাভাবিক পরিণতি।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি যতই বল, নান্টুদা এবারে বদলেছে।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, এটা ওর পরিবর্তন নয়—এর নাম সাময়িক অবসাদ

মঞ্জুষা কহিল, মিনুদা ভুলে যাচ্ছ যে নান্টুদাও মানুষ। তারও মন বলে একটা পদার্থ আছে।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে উত্তর দিল, এরা আর এক জাতের মানুষ। এদের মনের সুর অন্য পরদায় বাঁধা। দৃষ্টিভঙ্গী ওদের আলাদা।

মঞ্জুষা অকস্মাৎ নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে মৃন্ময়কে প্রশ্ন করিল, এই যদি নান্টুদার সত্যিকার জীবনের ধারা হয় তো তার নাম কি বেশ থাকা? এর মধ্যে আনন্দ বা পরিতৃপ্তি কোথায়? অথচ একেই তুমি ভালো বলে একতরফা রায় দিয়েছ।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মঞ্জু? এ যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করো না মিনুদা।

মৃন্ময় তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, এর মধ্যে চাপা দেবার কি থাকতে পারে আমি ত ভেবেই পাই না। একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল, সব কথার মধ্যে নিজেদের টেনে আন কেন, এতে সহজ কথাটাও যে আর সোজা ভাষায় বলা চলে না, অথচ মন নিরর্থক সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ের কথা মানিয়া লইয়া মঞ্জুষা কহিল, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার বক্তব্য তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি যেন আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে একটা বিশৃঙ্খল ভবিষ্যৎ জীবনকে দেখতে পাই। আমার সাধারণ বুদ্ধিও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও—দাও, কিন্তু দোহাই মিনুদা এর মধ্যে তোমার যুক্তি-তর্ক টেনে এনো না। আমি মেনে নিচ্ছি তোমার যুক্তির কাছে দাঁড়াবার মত কোন পুঁজি আমার নেই।

মৃন্ময় তাহার হাসি থামাইয়া কহিল, না মঞ্জু, হাসি বা যুক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝি না, হঠাৎ এই ধরণের চিন্তা তোমার মাথায় স্থান পেল কেন? আমার যতদূর বিশ্বাস আমার তরফ থেকে এমন কোন ব্যবহার তুমি পাও নি...

মৃন্ময়কে তার কথার মাঝখানে থামাইয়া দিয়া মঞ্জুষা কহিল, কোন কারণ নেই বলেই ত যুক্তিতর্কের প্রশ্ন তুলেছি। কিন্তু···জ্যাঠাইমা আসছেন, চুপ।...

মৃন্ময়ের মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কহিলেন, মঞ্জু কতক্ষণ এসেছ মা? এইমাত্র তোমাদের ওখান থেকেই আসছি। তোমার মা ডেকে পাঠালেন, কিন্তু আমি এক সমস্যায় পড়েছি মিনু। অথচ না বলতেও পারলাম না। অনেক করে বললেন।

মঞ্জুষা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মৃন্ময় মায়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মা আপন মনে বলিয়া চলিলেন, তা ছাড়া ভেবে দেখলাম যে, তোর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। এক কাজে দু'কাজই হয়ে যাক্।

মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, কি বাজে বকছ মা। আমার শরীর আবার তুমি খারাপ দেখলে কোথায়? আর এক কাজে দু'কাজ কাকে বলছ তুমি?

মা ধমক দিয়া কহিলেন, কথার উপর কথা বলিস নে মিনু। আমার এক জোড়া চোখ আছে। বলুক না মঞ্জু, আমি মিথ্যে বলেছি কি সত্যি বলেছি!

মৃন্ময় কহিল, তুমি বলতে চাও কি মা?

মা বলিলেন, এটা তোর পরীক্ষার বছর তাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু সঙ্গে খানকয়েক বই নিয়ে গেলেই ত চুকে যায়। মঞ্জুদের সঙ্গে তোকে কক্‌স্ বাজার যেতে হবে—সেই কথাই হচ্ছিল ওর মার সঙ্গে।

মৃন্ময়ের ইচ্ছা হইতেছিল চীৎকার করিয়া বলে, ছাই চুকিয়া যায়। মা যদি কিছু বোঝেন। কিন্তু সে নীরব রহিল।

মা পুনশ্চ কহিলেন, মঞ্জু ওরা লক্ষ্মীপূজোর পরেই যাবে। ওর মার ইচ্ছে তুই সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসিস।

মৃন্ময় কহিল, আর তুমিও অমনি চট করে কথা দিয়ে এলে, কিন্তু আমি ভাবছি তোমার কথা শেষ পর্য্যন্ত থাকে কিনা। আমাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা ফিরতে হবে মা।

মা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আমরা ত আর লেখাপড়া-জানা-মা নই যে, হিসেব করে কথা দেব। তিনি চলিয়া গেলেন।

মঞ্জুষা এতক্ষণ একটি কথাও কহে নাই, কিন্তু মৃন্ময়ের মা প্রস্থান করিতেই সে কহিল, কথাটা একটু পরে বললেও পারতে মিনুদা। উনি কি ভাবলেন বলতো ?

মৃন্ময় কহিল, যা আমাকে বলতেই হবে তা এখন বলা আর দু'মিনিট পরে বলা একই কথা। কিন্তু তুমি তখন কি বলছিলে ত ?...যে কথা বলিতে গিয়া মঞ্জুষাকে মাঝপথে থামিতে হইয়াছে মৃন্ময় সেই সম্বন্ধে একটা খোলাখুলি আলোচনা করিতে চায়।

মঞ্জুষা কহিল, আমার যা বলবার সে ত বলা হয়ে গেছে মিনুদা।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে আমার বলবার কিছু নেই। জোর করতেও চাই না।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার সম্বন্ধে আমার বড় ভয় হয় মিনুদা। মঞ্জুষার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী ঠেকিল। মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পুনরায় সে কহিল, আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই বল তো যা নিজেই আমি ভাল করে বুঝে উঠতে পারি না।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, অথচ এই নিয়েই তোমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আমার সত্যিকার মনের কথা তুমি কি জান না মঞ্জু ?

মঞ্জুষা কহিল, সেই একই কথায় আমরা ফিরে এসেছি মিনুদা। আমি সব বুঝি। যা বুঝি না তা নিতান্তই ব্যক্তিগত।

মৃন্ময় কহিল, তা হলে কি এই কথাই আমি বুঝব যে, আমার তোমাদের সঙ্গে না যেতে চাওয়া নিয়েই তোমার মনে খটকা বেধেছে ?

মঞ্জুষা নীরব রহিল।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, চুপ করে থেকো না মঞ্জু।

মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল; এক কথা বার বার বলে কোন লাভ নেই। কিন্তু আর নয় এবারে আমি যাই।

মৃন্ময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, তুমি রাগ করেছ; এ সব রাগের কথা মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, রাগ! না রাগ করতে যাব কেন। সে আর দাঁড়াইল না। চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। মৃন্ময় ডাকিল, আমার কথা আছে—দাঁড়াও মঞ্জু। কিন্তু মঞ্জুষা শুনিয়াও শুনিল না।

১১

মঞ্জুষা চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সারাটা পথ শুধু মৃন্ময়ের আহ্বান তার কানের কাছে ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল। "আমার কথা আছে—মঞ্জু দাঁড়াও" কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাভ কি। শুধু একই কথার পুনরাবৃত্তি বৈ ত নয়। ধৈর্য্য থাকে না। সে অনবরত শুধু স্তুতি করিবে আর মৃন্ময় বারংবার যুক্তি দেখাইবে—ইহা তর্কস্থলে মূল্যবান হইলেও মঞ্জুষা আহত হয়। না হয় সে ভুলই করিয়াছে, কিন্তু তার অনুরোধের কোন মূল্যই কি নাই? মঞ্জুষা ভাবে, মৃন্ময় হয়ত ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ব্যথা দিতেছে। নহিলে এই সাধারণ ব্যাপার লইয়া এত কথার সৃষ্টি হইত না। কিন্তু সেও বুঝাইয়া দিবে যে, মঞ্জুষা এসব গ্রাহ্য করে না। অথচ অগ্রাহ্য করিবার যত কল্পনাই মঞ্জুষা করুক না কেন গভীর রাত্রে একলা ঘরে এই কথা নূতন করিয়া ভাবিতে বসিয়া তাহার দু-চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিয়া

পড়িল। মৃন্ময় তাহার সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তার অন্তরের নির্দ্দেশ প্রত্যেক বারেই মৃন্ময়ের যুক্তিতর্কের জালে জড়াইয়া পড়িয়া অচল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মনের আবেদন এত হিসাব করিয়া চলে না। অধিকারের দাবি আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, গণিত-শাস্ত্রের চুলচেরা হিসাব সেখানে নিছক অর্থহীন।

মঞ্জুষা নূতন করিয়া ভাবিতে বসে। মৃন্ময় কি কেবল য়ুক্তিতর্কই দেখাইয়াছে ? না যুক্তি তার আবেদনের রূপ লইয়াই বারংবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে নিজেও কিছু কম স্বার্থপর নয়, নহিলে মৃন্ময়ের দিকটা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছে না কেন। হয় ত এই সময় এক সপ্তাহের ক্ষতি মৃন্ময়ের কাছে নিতান্ত অবহেলার নয়, অথচ তাহাদের সহিত না যাওয়ায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধিই হইবে না। তা ছাড়া এই সাধারণ ব্যাপারটা লইয়া মঞ্জুষা যেন কতকটা বাড়াবাড়ি করিতেছে। মৃন্ময় হয় ত এই কথাটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে চাহে। কিন্তু মঞ্জুষা তার একগুঁয়েমির জন্য এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করিতে চাহে না। কথাটা মৃন্ময় নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। অযথা দশ জনকে বাজে কথা সৃষ্টির সুযোগ দিয়া লাভ কি। তার নিজের মা কি ভাবিয়াছেন কে জানে ? হয় ত মেয়ের এই প্রকাশ্যতার লজ্জা ঢাকিতে গিয়াই তাহাকে নিঃশব্দে মানিয়া লইয়া একটা সহজ পরিস্থিতির উদ্ভব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অকস্মাৎ মঞ্জুষা যেন নিজের কাছেই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। তবে সান্ত্বনা এই যে, তার ছেলেমানুষির সাক্ষী আছে শুধু মৃন্ময় এবং তার মা—যাঁদের কাছে তার লজ্জা আপনিই ঢাকা পড়িয়া যাইবে। তবুও এই একলা ঘরে মঞ্জুষা নিজেকেই বার বার ধিক্কার দিল। কালই সে মৃন্ময়ের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আসিবে। দ্বিধা...সঙ্কোচ...

এ এক মজা বটে ! মঞ্জুষা জানে এখানে তার দ্বিধা অথবা সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন নাই। তবুও বাধা আসিয়া প্রতি পদে গতিরোধ করিয়া

দাঁড়ায়। এই অনাবশ্যক দ্বিধা এবং সঙ্কোচ যে ব্যক্তিগত জীবনে কত বড় পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করে একথা সকলেই অনুভব করে, কিন্তু অভ্যাসের জের কাটাইয়া উঠা সহজ নয়। তাই পরিবর্ত্তন, তাই ভুল বোঝা, অন্যায় সন্দেহ করা···অবিচার করা। মঞ্জুষা বসিয়া বসিয়া এমনি কত কথাই ভাবিতেছিল।

ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার—শুধু চুণকামের সাদা পোঁচগুলি চোখে পড়ে। মঞ্জুষা জানালা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। কোথাও জনমানবের সাড়া নাই। শুধু থাকিয়া থাকিয়া অস্ফুট একটি গানের সুর তার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। কি জানি কার কণ্ঠস্বর—হয় ত রাধু বোষ্টমের। এমনি রাত-বিরেতে তারস্বরে গান করিবার তার অভ্যাস আছে। মিনুদা বলে, রাধু বোষ্টম রোজই গভীর রাত পর্য্যন্ত গান গায়। কথাটা হয় ত সত্য। কিন্তু মঞ্জুষার আজ কি হইয়াছে, এমন সামান্য কারণে এতটা বিচলিত কোনদিন সে হয় নাই। মৃন্ময়কে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু কিছু দিন হইতেই কেমন একটা অস্বস্তিকর চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ইহাকে না পারা যায় ঝাড়িয়া ফেলিতে, না পারা যায় মনের মধ্যে পোষণ করিতে—অথচ সাদা চোখে চাহিয়া দেখিলে এর কোন যথার্থ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবুও মনের চাঞ্চল্য দূর হয় না। অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইয়া পড়ে। মঞ্জুষা লজ্জিত হয়। দীনু ঘোষালের মেয়েটা ত সেদিনে মুখের উপরই বলিয়া বসিল, বিয়ের আগে পরিচয় না থাকলেও, আমরাও ভালবাসতে জানি, তা বলে এমন পাগল হতেও দেখি নি। তোমাদের বড় লোকদের সবই ভাই আলাদা।

মঞ্জুষা উঠিয়া আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। দেউড়িতে তখন চোবে বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

রাত অনেক হইয়াছে। মঞ্জুষার চোখে ঘুম নাই। এই সব আজেবাজে চিন্তা করিতে তার ভাল লাগে না। কাল সকালে উঠিয়াই সব কথা সে মৃন্ময়কে বলিয়া আসিবে। কিন্তু কি বলিবে সে, বলিবার আছেই বা কি! যতটুকু বলিবার তাহা ত সে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছে। নূতন করিয়া একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। তা ছাড়া ভালও লাগে না মঞ্জুষার। তার মাথার মধ্যে রাশি রাশি এলোমেলো চিন্তার আনাগোনা চলিয়াছে, যাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তার লোপ পাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল মঞ্জুষা নিঃশব্দে আপন শয্যায় ঘুমাইতেছে। কিন্তু মনের উপর ক্লান্তির বোঝা এবং অবসাদ লইয়া পরদিন যথাসময়ে তার ঘুম ভাঙিল।

মা বলেন, তোর শরীর খারাপ নাকি মঞ্জু?

বাবা ব্যস্ত হইয়া বলেন, এ সব ত ভাল কথা নয় মা। অসুখ হলে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মঞ্জুষা পিতার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে প্রতিবাদ জানাইল। কহিল, কিছু হলে তবে ত জানাব বাবা। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি তাই। —কিন্তু আয়নায় সহসা নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে নিজেও কম বিস্মিত হইল না এবং বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়াই নীরবে প্রস্থান করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে পুনরায় মায়ের ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া মৃন্ময়ের গলার সাড়া পাইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঞ্জুষা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মৃন্ময় বলিতেছিল, মার কাছে আপনার প্রস্তাব শুনলাম, কিন্তু আমার মনে দ্বিধা এসেছে। আমার পরীক্ষার আর মোটেই দেরি নেই। এ সময় একটি মুহূর্ত্তও আমার কাছে কম নয়। তা ছাড়া সাফল্য এবং অসাফল্য বলেও দুটো কথা আছে। যদি অন্য কোন কারণেও

আমি অকৃতকার্য্য হই, তা হলে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় ত আপনাদের উপর দোষারোপ করবার ইচ্ছে আমার হতে পারে। আমাকে এ কথা ভাববার অবকাশ আপনি দেবেন না। আমি না এলেও ত আপনাদের যাওয়া আটকাত না।

মঞ্জুষার মা কহিলেন, তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন মিনু। তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হোক এ কেউই চায় না। চাওয়া উচিতও নয় বাবা।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, আমি জানি আপনি সহজেই আমার কথা বুঝবেন। মৃন্ময় আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। দরজার পাশে মঞ্জুষার সহিত তাহার দেখা হইলেও সে একটা কথাও কহিল না। ইচ্ছা করিয়াই পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

মঞ্জুষা বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইলেও মুখ ফুটিয়া তাহাকে ডাকিল না। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে মায়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া মা কি বুঝিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কতকটা যেন কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে কহিলেন, পড়াশুনোর ক্ষতির কথা যখন বলছে তখন আর জোর করে ওকে সঙ্গে নেওয়া যায় কেমন করে।

মঞ্জুষার মনের যত উষ্মা এবং বিরক্তি গিয়া পড়িল মায়ের উপর। সে উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, কে তোমাকে জোর করতে বলছে শুনি যে আমাকে কথা শোনাচ্ছ!

মা হাসিমুখে কহিলেন, বলবে আবার কে মঞ্জু। সব কথা কি বলতে হয় মা। কিন্তু অত রাগ করছিস কেন?

মায়ের এই শান্ত অনুযোগে এবং নিজের অকারণ উষ্ণতায় মঞ্জুষা অত্যন্ত লজ্জিত হইল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, রাগ ত করি নি মা। রাগ

করতে যাব কিসের জন্যে। যার খুশী যাবে, যার খুশী যাবে না, তাতে আমার রাগ করবার কি থাকতে পারে।

মা পুনরায় হাসিলেন। কিন্তু মঞ্জুষা যেন আর তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল এবং নিজের ঘরে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। তার রাগও যেমন হইল, অভিমানও তার চেয়ে কম হইল না; মুখ তুলিয়া একবার চাহিল না, ডাকিয়া একটা কথাও কহিল না। মিনুদা দিন দিন সত্য সত্যই বদলাইয়া যাইতেছে। মঞ্জুষা আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তার এইরূপ আচরণের তাৎপর্য্য কি? সে আজ নিশ্চয় ঝগড়া করিবে। মঞ্জুষা মৃন্ময়দের বাড়ী যাইবার জন্য অকস্মাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু বৃদ্ধ তেওয়ারী অন্যত্র কাজে চলিয়া যাওয়ায় এবং রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সে নিরস্ত হইল। কিন্তু বৈকালে রৌদ্র পড়িতেই সে তেওয়ারীকে লইয়া মৃন্ময়দের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও মঞ্জুষা গম্ভীর হইয়া রহিল, অথচ আজ সকালেও সে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া মৃন্ময়ের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া লইতে মনস্থ করিয়াছিল।

মঞ্জুষা একটু নির্লিপ্ত কণ্ঠেই কহিল, থাক অতটা সহ্য হবে না। তখন ত কই চিনতেও পার নি। মা কি ভেবেছেন বল ত?

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তিনি আবার কি ভাবতে যাবেন মঞ্জু? তুমি দেখছি শেষ পর্য্যন্ত আমায় পাগল করে তুলবে। একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনশ্চ কহিল, তুমি ভেবো না মঞ্জু, তিনি কিছুই ভাবেন নি। সোজা কথাকে তিনি সহজ এবং সরল ভাবেই নিয়েছেন। যুক্তিতর্কের ধার দিয়েও যান নি।

মঞ্জুষা কহিল, যুক্তিতর্কের ধার আমিও ধারি না। আমাদের মেয়ে-জাতের কাছে যুক্তিতর্কের চেয়ে মনের ইঙ্গিতের মূল্য ঢের বেশী। যদি

কোনদিন ঠকতেও হয় একেবারে দেউলে হতে হবে না, অন্ততঃ ভাবতে পারবে—কিছু ত পেয়েছে।

মঞ্জুষা মৃন্ময়ের অজ্ঞাতে একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গেল এবং নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। সকালবেলা মঞ্জুষাদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসা অবধি মৃন্ময় বারবার করিয়া ভাবিতেছিল যে, একবার গেলে হইত। তর্কের খাতিরে যত কথাই সে বলুক না কেন মঞ্জুষার অনুরোধ তার কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই অতি বড় সত্যটা কি মঞ্জু উপলব্ধি করে না? মৃন্ময় নিজেকে নিজে বহুবার এই প্রশ্ন করিয়াছে।

মৃন্ময় সহসা মঞ্জুষার একখানি হাত ধরিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার মনে কি অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে? আমায় বলো ত মঞ্জু।

মঞ্জুষার দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, না—

মৃন্ময় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, অবিশ্বাস করো না মঞ্জু। তুমি কি আমায় জানো না, না মনে করো অতীতকে আমি ভুলে গেছি। আমি বুঝতে পারছি, কেন তোমার এই ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। তোমাদের সঙ্গে যেতে না চাওয়ার আর যাই কারণ থাক তোমাকে অবহেলা করা নয়। অথচ তুমি তাই ভেবে নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও দুঃখ দিচ্ছ।

একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, যে কথা তোমার মাকে জানিয়েছি তোমাকেও সেকথা আমি গোপন করি নি। তুমি যদি সব কথাই উল্টো করে বোঝ তবে কোথায় দাঁড়াই বল ত। অথচ তোমার কাছ থেকেই আমি সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহ পাবার আশা করেছিলাম।

মঞ্জুষা এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, তুমি আমায় মাপ করো মিনুদা। আমি হয়ত আগাগোড়াই ভুল করেছি, কিন্তু তুমিও আমায় ভুল বুঝেছ। তোমায় অবিশ্বাস আমি করি না, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার কেমন ভয় হয়। অথচ এ ভাবটা কিছু দিন আগেও আমার ছিল না

মিনুদা! নইলে আমি কি সত্যিই বুঝি না যে, তোমায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার এ আগ্রহ আমার কোনো দিক দিয়েই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর নয়। এ নিয়ে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। তার চেয়ে চলো যাই দু'জনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, কোথায় যেতে চাও।

মঞ্জুষা কহিল, নদীর পাড়ে অথবা রাধু বোষ্টমদের পাড়ায়।

মৃন্ময় কহিল, পুণ্য সঞ্চয় করতে নাকি?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, সে আবার কি?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, তোমার গোপন দানের খবর আমার কানে এসেছে মঞ্জু।

মঞ্জুষা ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, ঠাট্টা করছ বটে, কিন্তু সব কথা জানলে তুমিও খুশী হতে। ও-তরফের বড়বাবুর পাকা মাথা এ তরফের নিরীহ অশিক্ষিত সরল লোকগুলোকে একেবারে উচ্ছেদ না করে ছাড়বে না। ক্ষেত, খামার, লাঙ্গল ছেড়ে সব মিলের শ্রমিক হয়েছে। পয়সাও নাকি ভালই পায়, কিন্তু প্রয়োজনের দিনে কারুর ঘর থেকে পাঁচটি টাকা একসঙ্গে বেরোয় না।

বাধা দিয়া মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, তাই বুঝি তুমি রাধু বোষ্টমের হাত দিয়ে তাদের সাহায্য পাঠাও?

মঞ্জুষা কহিল, কথাটা তোমার কানেও গিয়ে পৌঁছেছে তা হলে। আজ বড়তরফের কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা যে এই নিরালা পল্লীর মানুষগুলোর চোখে পড়েছে, তাকে নিছক একটা দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলে মস্ত বড় ভুল করা হবে মিনুদা। মহানগরীর হাওয়াই শুধু আজ বইতে সুরু করেছে। কিন্তু আরম্ভেই যদি এর গতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা

যায় তবেই গ্রামের লোকগুলো হয়তো আরও কিছুদিন মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারবে।

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, তুমি বলতে চাইছ কি মঞ্জু?

মঞ্জুষা কহিল, দেশের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধের এ অভিযানকে আমাদের থামিয়ে দেওয়া আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মিনুদা। নইলে সবাইকে নিঃশেষে লোপ পেতে হবে। সমতার ভিত্তিতে আমাদের নূতন করে গড়ে তুলতে হবে সমাজকে। তোমার আশেপাশে একবার চেয়ে দেখ ত মিনুদা। কোথায় এসে আজ আমরা দাঁড়িয়েছি—কেন নিজেদের এমন অসহায় বলে আমাদের মনে হচ্ছে।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার মনে আজ এ ভাব দেখা দিয়েছে কেন তা বুঝেছি, কিন্তু তোমার দান-খয়রাতের তাৎপর্য্য আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি মঞ্জু। তা ছাড়া এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধই বা কোথায়?

মঞ্জু কহিল, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই রয়েছে মিনুদা। দুটো মিষ্টি কথা কিংবা জোরালো বক্তৃতায় মানুষের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিলেও তাতে তার পেট ভরে না। তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে একটা নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়। আর সে দায়িত্ব যুগ যুগ ধরে পালন করা হয় নি বলেই আজ ছোট-বড়, উঁচু-নীচুর প্রশ্নটা এত জটিল এবং মারাত্মক হয়ে সমাজ-জীবনকে ভয়াবহরূপে পঙ্গু করে তুলছে। যে দুষ্ট ব্যাধি আজ আত্মপ্রকাশ করেছে, আমাদের চণ্ডী, হিরু, রামু ও ভোলার দেহে এবং মনে, সময় থাকতে থাকতে তাতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হয়তো এখনও সময় আছে।

মৃন্ময় কহিল, তুমি পাগল হয়েছ মঞ্জু। যে ব্যাধিতে দেশের সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে তা তোমার দু-দশ টাকা দান-খয়রাতে নিরাময় হয়ে উঠবে এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় কে দিয়েছে বলতো?

মঞ্জুষা কহিল, তুমি বারে বারেই শুধু দান-খয়রাতের কথা নিয়ে আমায়

খোঁচা দিচ্ছ মিনুদা, কিন্তু এ দান-খয়রাত নয়। আমি যেমন করেই হোক বড় তরফের অতল গহ্বর থেকে এদের উদ্ধার করব। এরই মধ্যে আমি জনকয়েককে হাত করেছি। ওরা নরম মাটি মিনুদা, এ দিয়ে যেমন দানব সৃষ্টি করা যায় তেমনি দেবতাও গড়ে তোলা যায়। ওদের শিক্ষাদীক্ষা নেই বটে, কিন্তু প্রবল অনুভূতি আছে। সেখানে ফাঁকির স্থান নেই। তাই ত আজ রক্ত এবং অশ্রুর বন্যায় আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। বাবা বলেন, এ হতেই হবে নইলে ভগবানের বিধান উল্টে যাবে যে।

মঞ্জুষাকে থামাইয়া দিয়া মৃন্ময় কহিল, আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নিয়েই তুমি নাড়া দিয়েছ। জানি না এ খেয়াল তোমার মাথায় কে ঢোকালে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারবে ত মঞ্জু?

মঞ্জু কহিল, কিছু না হোক একটা গভীর ছাপও যদি আমাদের সমাজের বুকে এঁকে দিতে পারি তা হলেও নিজেকে সার্থক মনে করব। বাবা আমার সবচেয়ে বড় সহায় হয়েছেন মিনুদা।

একটু থামিয়া মৃদু হাসিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, আমার মাথায় অনেক মতলব আছে মিনুদা, যদি সময় এবং সুযোগ পাই তবে দেখবে। কিন্তু আজ এ সব আলোচনা থাক; কোথায় বেড়াতে যাবে বলছিলে না?......

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। তেওয়ারী নিঃশব্দে তাহাদের অনুসরণ করিল। গাঙ্গুলীদের পুকুরের পাড়ে আসিয়া মৃন্ময় সহসা থামিল, কহিল, আর একদিন তোমাকে চেনবার একটা সুযোগ এই পুকুর পাড়েই আমার হয়েছিল। জলপদ্ম তুলবার কথা আমি আজও ভুলি নি। সেদিন তোমায় দেখেছিলাম আজও দেখছি। আর মনে হচ্ছে ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি তোমরা।

মঞ্জুষা মৃন্ময়ের কথার ধরণে হাসিয়া ফেলিল।

মৃন্ময় কহিল, এগোই চলো।

উভয়ে পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিল—কতকটা যেন অন্যমনস্ক ভাবে। সহসা রাধু বোষ্টমের আহ্বান তাদের কানে পৌছিল। রাধু বলিল, তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম দিদিমণি। কিছু টাকার দরকার পড়ে গেছে। ওদিককার কাজ অনেক গুছিয়ে এনেছি। নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসেই সব ঠিক করে ফেলব।

মঞ্জুষা কহিল, আমরাও তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম বোষ্টম-দা। কিন্তু হঠাৎ নবদ্বীপ কেন?

রাধু এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া সলজ্জভাবে একটু হাসিল। মঞ্জুষাও আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। কিন্তু মৃন্ময় থামিতে পারিল না, কহিল, মঞ্জুর কথার জবাব দিলে না ত বোষ্টম-দা।

রাধু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কথাটা যখন নিজেই সত্যি বলে জানি না তখন আর শুনে করবে কি। একটা উড়ো খবর পেয়েছি বৈ তন য়।

মৃন্ময় পুনরায় কি বলিতে উদ্যত হওয়ায় মঞ্জু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিল। মৃন্ময় থামিল, কিন্তু রাধু ক্ষান্ত হইল না। কহিল, যার ঘর ঝড়ে একবার উড়িয়ে নিয়ে গেছে, মৃদু বাতাস দেখলেই সে চমকে ওঠে দাদাঠাকুর। দুঃখ যদি পাই, একলাই পাব। হঠাৎ থামিয়া রাধু কেমন একপ্রকার হাসিতে লাগিল, এবং আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই মঞ্জুষা তাহাকে পরদিন সকালে দেখা করিতে জানাইল। রাধু ততক্ষণে অনেক-দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

মঞ্জুষা কহিল, ওর কিছু একটা ঘটেছে মিনুদা।

মৃন্ময় কহিল, সে তো দেখতেই পেলাম, কিন্তু হঠাৎ নবদ্বীপ কেন? সাদি করতে মন গেছে নাকি?

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল।

মৃন্ময় কহিল, অবশ্য কণ্ঠি বদলও হতে পারে।

মঞ্জুষা কহিল, তা পারে—কিন্তু আর কতটা পথ যাবে মিনুদা ?

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, রাত হোক……চাঁদ উঠুক……

মঞ্জুষা কহিল, খুব কবিত্ব হচ্ছে যে···

মৃন্ময় মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া কহিল, মৃন্ময় আজ কাকে সঙ্গে করে পথে বেরিয়েছে ?

মঞ্জুষা কহিল, সঙ্গে করে নূতন বেরিয়েছে নাকি ? খালি বাজে কথা।

মৃন্ময় ডাকিল, মঞ্জু—

মঞ্জুষা সাড়া দিল—কি।···

মৃন্ময় কহিল, আমাদের ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে ?

মঞ্জুষা কহিল, পড়ে। ঐ বুড়ো বটগাছ তলায় তুমি চুপ করে বসে মাছ ধরা দেখছিলে আর মঞ্জু নামে একটা দুষ্টু মেয়ে এসে তোমার চোখ টিপে ধরেছিল।

মৃন্ময় কহিল, সেদিনের সেই দুষ্ট মেয়েটা এখন কিন্তু বেশ লক্ষ্মী আর শান্ত হয়েছে, কিন্তু সেদিনের সেই ভাল ছেলেটি এখন আর তেমন ভাল নেই। কথা শুনতে চায় না। কথায় কথায় ঝগড়া করে। তা বলে সেই মেয়েটিকে কিন্তু ছেলেটি রীতিমত ভয় করে।

মঞ্জুষা হাসিতেছিল, কহিল, ছাই করে।

মৃন্ময় কহিল, আলবৎ করে। সেজন্যেই সে মেয়েটিকে মায়ের ঘর থেকে পালাবার পথে দেখেও দেখতে পায় নি।

মঞ্জুষা কহিল, ওর নাম বুঝি ভয় করা ?

মৃন্ময় কহিল, তবে কি ? ভালবাসা···?

মঞ্জুষা কহিল, জানি না।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপচাপ। মৃন্ময় ডাকিল, মঞ্জু।···

মঞ্জুষা জবাব দিল, কি !···

মৃন্ময় কহিল, এবার কলকাতা থেকে এসে শুধু ঝগড়াই করেছি—

মঞ্জুষা কহিল, আর ভালমুখে একটা কথাও বলনি।···মঞ্জুষা হাসিমুখে কহিল, তোমার কাছে এ সব কথা কে শুনতে চেয়েছে মিনুদা। এরপর সত্যি সত্যিই কিন্তু রাগ করব।

তেওয়ারী জানাইল, তাহারা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

মৃন্ময় বলিল, তুমি ফিরে যেতে পার তেওয়ারী। আমরা আরো খানিক ঘুরে বেড়াব।

মঞ্জুষা হাসিল। কথাটা যে নিতান্ত ঠাট্টা ইহা তেওয়ারীর বুঝিতে দেরী হইল না। কিন্তু সে নীরব রহিল। তাদের কথা এখনও হয়তো অনেক বাকি আছে।

মৃন্ময় কহিল, বসবে খানিক ঐ বুড়ো বটগাছতলায়?

উভয়ে গাছতলায় বসিল। মৃন্ময় ঘাসের উপর শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। মঞ্জুষা বাধা দিয়া কহিল, এই ধূলোবালির মধ্যে—

মৃন্ময় কহিল, ধূলোবালি আবার কোথায় দেখলে? সে সটান শুইয়া পড়িল।

মঞ্জুষা কহিল, তারপর—

মৃন্ময় বলিল, তারপর শ্রীমতী মঞ্জুষার হাতের আঙুলগুলো শ্রীযুক্ত মৃন্ময়ের মাথার চুলের মধ্যে আনাগোনা করুক।

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল এ তো পুরোনো কাব্য···আর কিছু?

মৃন্ময় কহিল, চাঁদের আলো তো এখনও দেখা দেয় নি।

মঞ্জুষা বলিল, পচা কাব্য—ততোধিক জীর্ণ। এ কখনও বাঁচতে পারে না। আর কিছু?···কিন্তু তোমার কি হয়েছে বলতো আজ? পাগল হয়েছ—তেওয়ারী যে ওখানে বসে আছে—তাও কি ভুলেছ?

মৃন্ময় কহিল, ভুলব কেন?

তেওয়ারী পুনরায় তার উপস্থিতি জানাইয়া দিল।

মঞ্জুষা কহিল, তৃতীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা চলে না। সব সময় এরা গোলোযোগের সৃষ্টি করে থাকে। আজ এখন ওঠা যাক্।

তেওয়ারীর কান হয়তো এই দিকেই ছিল। পুনরায় সে জানাইল যে, রাত অনেক হইয়াছে। আর দেরি করা উচিত হইবে না।

উভয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জুষা চলিতে চলিতে কহিল, আজকের দিনটা কিন্তু সত্যিই আমার ভাল কেটেছে মিনু-দা।

মৃন্ময় কহিল, হঠাৎ একথা কেন মঞ্জু?

মঞ্জুষা জবাব দিল, তা জানি না।

মৃন্ময় তার বাহুমূলে একটু চাপ দিয়া কহিল, তুমি পাগল তাই মিথ্যে কষ্ট পাও। মঞ্জুষা প্রতিবাদ করিল না। নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

১২

মৃন্ময় কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। মঞ্জুদের সঙ্গে সে যায় নাই। মঞ্জুষাও তাহাকে যাইবার জন্যে অনুরোধ করে নাই। এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তার মনে পড়িল লিলিকে, মনে পড়িল সুনির্ম্মলকে। কিন্তু সুনির্ম্মলের খোঁজে আসিয়া সে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল। প্রথমত সে বিশ্বাস করিল না, তার পরে বিশ্বাস যদি বা করিল, কিন্তু মন নানা সন্দেহে দোলা খাইতে লাগিল। রুবি যাহা বলে তাহা সবই কেমন ভাসা ভাসা। ও বলে, কিছুই জানতাম না, তবে কোথাও যে বড় রকম

কিছু গোল বেধেছে এ কথা দাদার শঙ্কিত চালচলন দেখে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ জেগেছে।

মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, কিন্তু এ যে বড় অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি। কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে বলেই সে অন্যায় করতে যাবে কেন!

রুবি কহিল, কিন্তু বিলেত যেতে কেউ ত তাকে কোন দিন বাধা দেয় নি যে, এমন চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে।

মৃন্ময় কহিল, হয়তো আপনাদের তরফ থেকে কোন রকম বাধা পাবার আশঙ্কা তার ছিল।

রুবি অকস্মাৎ মৃন্ময়কে প্রশ্ন করিয়া বসিল, দাদার বিলেত যাবার কথা আপনার কাছে সে কোন দিন প্রকাশ করেছে কি?

মৃন্ময় কহিল, না।

রুবি কহিল, আপনার কথার জবাব আমি পরে দিচ্ছি, কিন্তু দয়া করে একটু বসুন আমি এখুনি আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রুবি পুনরায় সুরু করিল, আপনার তরফ থেকে বাধা আসবার ত কোন কারণই ছিল না অথচ আপনাকেও সে একথা জানায় নি। একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, মা সেই থেকে কান্নাকাটি সুরু করে দিয়েছেন।—রুবির চোখদুইটাও যেন সজল হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ মৃন্ময়ের সেইরূপই মনে হইল। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। রুবি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া বলিল, কান্নাকাটির হয়তো সঙ্গত কারণ নেই, কিন্তু আমাকে বড় নিরাশ হতে হয়েছে। লিলিদির মত মেয়েকেও শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হয়েছে।

মৃন্ময় সহসা এক প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমি এর অপর দিকটাও তো ভাবতে পারি রুবি দেবী।

রুবি কহিল, অসম্ভব মৃন্ময়বাবু। আমি যে ওদের ভাল করেই জানি।

মৃন্ময় কহিল, হয়তো সেইখানেই আপনার ভুল হয়েছে। কিন্তু আপনাদের লিলিদি বলেন কি?

রুবি কহিল, ওর কথা ছেড়ে দিন। তার মতে আমার ভাইয়ের খবর আমরাই সবার চেয়ে বেশী রাখি। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় বললে, বিলেতে একটা তার করে দাও, হয়ত কোন খবর পেয়ে যাবে। কি জ্বালা বলুন ত। খবরাখবর পাবার রাস্তাই যদি সে খোলা রেখে যাবে তবে তোমার কাছে যাব কিসের জন্য? অথচ আমার মন বলে···কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই সে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল। ও ঘরে চলুন মৃন্ময়বাবু, আমাদের চা দিয়েছে।

মৃন্ময় উঠিল। চলিতে চলিতে রুবি কহিল, আপনি এখান থেকে চলে যাবার দিন কয়েক পরেই দাদা নিরুদ্দেশ হয়েছে। একটা চিঠিতে তার গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ রেখে গেছে, কিন্তু কারণ জানায় নি। ব্যাঙ্কে খবর নিয়ে জানা গেল হাজার পনর তুলে নিয়ে গেছে। টাকার জন্য কিছুই নয়, কিন্তু তার চলে যাওয়ার ধরণটা আগাগোড়াই যেন কেমন খাপছাড়া। এর আদি-অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, আমার মনের খটকা কিন্তু এখনও যায় নি। লিলিদেবীর তরফ থেকে কোন রকম আশাভঙ্গের কারণ ঘটে নি ত? আপনার দাদার সঙ্গে তার একটা পাকা ব্যবস্থা হয়েছে বলেই ত সবাই জানত। আমি বলি তাঁকেই আর একটু চাপ দিয়ে দেখুন না?

রুবি কহিল, লিলিদি অতল সমুদ্র। তার মনের তলায় প্রবেশ করা আমার সাধ্য নয়। এতটুকু পরিবর্ত্তন তার কোথাও ঘটে নি। কোন দিক দিয়ে যে এক তিল ক্ষতি হয়েছে এমন মনেও হয় না। ঠিক তেমনি

সহজ, তেমনি সরল। অথচ দাদার সম্বন্ধে ওর মনের কথা আমি জানি সেখানে কোন ফাঁকি নেই।

মৃন্ময় কহিল, তা হলে কি আপনি বলতে চান—

তাহাকে বাধা দিয়া রুবি কহিল, হ্যাঁ মৃন্ময়বাবু, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমার দাদাই বদলালেন না। পরশ পাথরকেও তার কাছে হার মানতে হয়েছে।

উভয়ে পাশাপাশি চায়ের টেবিলে বসিল। মৃন্ময়ের দিকে চায়ের বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া রুবি পুনরায় বলিয়া উঠিল, আমাদের এখন ভারি বিপদ মৃন্ময়বাবু। টাকা আছে মানি, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে শুধু টাকা থাকলেই চলে না।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আপনি বলতে চাইছেন কি? ক্রমশঃ যে দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়েছেন আপনি!

রুবিকে কিছুক্ষণ যেন চিন্তাযুক্ত মনে হইল। একটু নারীসুলভ লজ্জাও যেন তার চোখে-মুখে খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল।

মৃন্ময় কহিল, আমায় মাপ করবেন। আপনি লজ্জা পাবেন জানলে আমি কোন কথাই বলতাম না।

রুবি মুখ তুলিয়া চাহিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই মৃন্ময়বাবু। আপনার সাহায্য পেতে হবে বলেই আমার সব কথা আপনাকে খোলাখুলি বলা দরকার। একটা সন্দেহ আমার মনে জেগেছে। ভগবান করুন এ সন্দেহ যেন মিথ্যে হয়, নইলে এত বড় অন্যায় তিনি কখনই ক্ষমা করবেন না।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিসের অন্যায়···কিসের ক্ষমা রুবি দেবী?

রুবি কহিল, আজ থাক মৃন্ময়বাবু। আমাকে ঘটনাটা আগে বুঝতে দিন।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ তা হলে আমি উঠছি।

রুবিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল, আর একটা অনুরোধ আপনাকে আমি করব। লিলিদি হয়তো পরীক্ষা দেবে। এটা তার পরীক্ষার বছর। আপনি নাকি তাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। যদি সম্ভব হয়—

কথাগুলি মৃন্ময় শুনিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই রুবি পুনরায় তাহাকে ডাকিল, মৃন্ময়বাবু—

মৃন্ময় ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রুবি কহিল, আপনি কি আর কিছুক্ষণের জন্য বসতে পারেন না ?

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, সে কথা ত আপনি একবারও বলেন নি ! সে পুনরায় ফিরিয়া গিয়া বসিল।

রুবি কহিল, আপনার উপর হয়তো কতকটা জুলুম করা হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করুন এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় নেই।

মৃন্ময় কহিল, সে কথা ত আমি কখনও বলি নি। তবে এ কথাও ঠিক যে, আপনার দাদার বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে এসব কথার মধ্যে আমার না থাকাই ভাল।

রুবি কহিল, এই যুক্তি দেখিয়ে যদি আপনি দূরে সরে যেতে চান সে আমাদের দুর্ভাগ্য। দাদার বহু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে। আপনারও হয়তো আছে এবং আমি যে নির্ব্বাচনে ভুল করি নি একথা আপনাকেও স্বীকার করতে হবে।

মৃন্ময় কহিল, এ আপনার ঔদার্য্য।

রুবি কহিল, আমি বলি স্বার্থপরতা। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। দয়া করে একটু খোঁজখবর রাখবেন এ আমার একান্ত অনুরোধ।

মৃন্ময় কহিল, হয়তো কোন প্রয়োজনেই আমাকে আসতে হবে না। কিন্তু তা হলেও সত্যিই যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হবে মনে করেন তবে একটা খবর দেবেন। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

রুবি কহিল, এর চেয়ে বড় প্রতিশ্রুতির আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি কি কলেজ হোষ্টেলেই উঠেছেন?

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, এ ছাড়া আর গতি কি? কলকাতা শহরে আপনাদের মত স্থায়ী আস্তানা ত আর আমাদের নেই।·· একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, আজ তা হলে চললাম।

মৃন্ময় অগ্রসর হইল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া রুবির চোখে মুখে এক বিচিত্র হা সি ফুটিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে অন্দরের পথে আগাইয়া চলিল।

মৃন্ময় ততক্ষণে রাস্তা ধরিয়া চলিতেছে। রুবির কথাগুলি তখনও তার কানে বাজিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া সে ভাবিতেছিল যে, সুনির্ম্মলের এই চলিয়া যাওয়ার মধ্যে উহারা বিপদের আশঙ্কা করিতেছে কিসের জন্য। তা ছাড়া সুনির্ম্মল বিলাত যাক আর জাহান্নামেই যাক তাহাতে মৃন্ময়ের কি আসিয়া যায়। ইহা লইয়া তাহার মাথা ঘামাইবার কি কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু মনে মনে সে যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করুক না কেন উহাদের খবরাখবর মৃন্ময়কে লইতে হয়। সুনির্ম্মল সম্বন্ধে তারও যে কোন কৌতূহল নাই তা নয়।

দিনকয়েক পরে পুনরায় মৃন্ময় দেখা দিল।

রুবি বলে, আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছি। পড়াশুনোরও নিশ্চয় ক্ষতি হচ্ছে।

মৃন্ময় রুবির কথায় সায় দিল। কহিল, একথা সত্য—

রুবি একটু মুষড়াইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, তা বলে বিকেল বেলা বেড়াতে বেরোন নিশ্চয়।

মৃন্ময় স্মিতহাস্যে কহিল, তা বেরুই বটে।

রুবি কহিল, সেই সময়টুকুই না হয় আমাদের জন্য ব্যয় হ'ল—

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখেই কহিল, সে ত হচ্ছেই। কিন্তু আর মাস-খানেক আমি আসব না। বড় ক্ষতি হচ্ছে আমার। পরীক্ষাটা শেষ হতে দিন, তার পর যত খুশী বিরক্ত করুন, আমি কিছু মনে করব না।

রুবি কহিল, এখন বুঝি করেন।

মৃন্ময় হাসিমুখেই কহিল, করি নে বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে তা আপনাদের উপর নয়, নিজের উপর। নইলে সত্য সত্যই আমার কোন ক্ষতি করবার সাধ্য আপনাদের নেই।

রুবি কহিল, আজ মাসকয়েক ধরে যে ভাবে আপনাকে নিয়ে টানা-টানি চলেছে এতে সহজ অবস্থায়ও মানুষের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। আপনার ত তবু যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু একটা অনুরোধ—ভুল করে যেন অবিচার করবেন না। একটা মানুষকে হঠাৎ এতখানি বিশ্বাস করে তার উপর নির্ভর করায় অনেকখানি অসঙ্গতি থাকলেও তা সব সময় মিথ্যে হয় না। মানুষের সহজ অনুভূতি বহু কঠিন সমস্যার সমাধান করে দেয়।

মৃন্ময় নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, তা হয়তো দেয়।

রুবি কহিল, হয়তো কেন মৃন্ময়বাবু। এর মধ্যে দ্বিধার স্থান কোথায়? অন্তরের নির্দ্দেশকে আমি বিশ্বাস করি এবং তা মেনে চলি।

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু আমি চলি না। বরং মন যা চায় তার উল্টো পথেই চলে থাকি।

রুবি নীরব।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, না জেনে শুনে কোন মানুষ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করাকে আমি ভাল মনে করি না। আপনারা কি যে করতে চান তা আজও আমি ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু সে যাই হোক সুনির্ম্মলের কোন খবর পেলে আমায় জানাবেন। আজ আমি উঠি।

রুবিকে আর দ্বিতীয় কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া মৃন্ময় প্রস্থান করিল।

১৩

এক মাসের উপর গত হইয়াছে। মৃন্ময় সেই যে আসিয়াছে আর যায় নাই। কতকটা পড়ার চাপে এবং কতকটা নিষ্প্রয়োজন বোধে। সত্যকার দায়িত্ব তার কতটুকু।

মৃন্ময়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর দুই দিন বাকী। সহসা রুবির জরুরী আহ্বান আসিল। মৃন্ময় জানাইয়া দিল যে, দুই দিনের আগে তার দেখা করিবার সুযোগ হইবে না। কিন্তু দুইটা দিনের ব্যবধান আর কতটুকু! দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল।

ইহার পরে মৃন্ময়কে দেখা গেল রুবিদের বাহিরের ঘরে চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকিতে এবং রুবিকে পাওয়া গেল তার পাশে নিঃশব্দে নতমুখে উপবিষ্ট অবস্থায়। রুবিই প্রথমে কথা কহিল, দাদার যে এত বড় অধঃপতন হতে পারে এ কথা কেমন করে ভাবা যায় বলুন ত? তার উপর সাফাই

গাইবার কি নির্লজ্জ চেষ্টা দেখুন। রুবি সুনির্ম্মলের লেখা একখানা চিঠি মৃন্ময়ের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, পড়ে দেখুন—

মৃন্ময় কহিল, আপনিই পড়ুন—

রুবি সহসা হাত কয়েক পিছাইয়া গিয়া কহিল, ঐ অনুরোধটি আমায় করবেন না। চিঠি রইল। ইচ্ছে হয় পড়ে দেখুন, নইলে ছিঁড়ে ফেলে দিন।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আপনাকে চলে যেতে হবে না রুবি দেবী। বসুন, আমিই না হয় পড়ছি।

চিঠিখানা রুবিকেই লেখা হইয়াছে।

"আমার চলে আসা নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। এখানে আমি কতকটা শান্তিতেই আছি। জীবনে আমি বড় আঘাত পেয়েছি—যার জন্যে তৈরি ছিলাম না। আমার মস্ত বড় দুঃখ যে, যেখানে আমার সবচেয়ে বড় বিশ্বাস ছিল সেখান থেকেই চরম শাস্তি পেয়েছি। আমি লিলির কথা বলছি। তার রূপ আছে, শিক্ষা আছে এবং হয়তো আরও অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না। পতন যে তার কোন্ পথ ধরে এসেছে তার প্রমাণ সে নিজেই দেবে। যতই তার শিক্ষা দীক্ষা থাক লিলি বাঙালীর মেয়ে। নিজের আসল সত্তাকে সে কখনই উপেক্ষা করতে পারে নি। তাইতো আমাকে মুক্তির পথ বেছে নিতে হয়েছে। ভরসা করি লিলি তার নিজের জন্যেই আমাকে রেহাই দেবে।"

সুনির্ম্মল

নিজের অজ্ঞাতে মৃন্ময়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, স্কাউন্ড্রেল। তার-পরেই গভীর নিস্তব্ধতা। এমনি আরও অনেকক্ষণ কাটিল। হয়তো

আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইত—সহসা একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মৃন্ময় শুষ্ক নীরস কণ্ঠে কহিল, যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখানে লজ্জা সঙ্কোচ ইত্যাদি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোকে আমাদের উপেক্ষা করে চলবারই হয়তো প্রয়োজন হবে। একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, এ দুর্ঘটনার জন্য আপনার দাদাই ষোল আনা দায়ী—এই কি আপনার অভিমত?

রুবি কহিল, এ মতামতের কথা নয় মৃন্ময়বাবু, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আমার দাদাকেও জানি, আর লিলিদিকেও চিনি।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, দেশে যাইবার পুর্ব্বেকার ঘটনাগুলি তার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। যাহা অতি সামান্য বলিয়া তখন নজরে পড়ে নাই আজ সেই সব অতি তুচ্ছ ঘটনা নূতন রূপ ধরিয়া মৃন্ময়ের মনে এক কূট চক্রান্তের আভাস দিয়া গেল। সুনির্ম্মলের চরিত্রের যে দিকটা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে একথা ভাবিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, মৃন্ময়কে শেষ পর্য্যন্ত জালে জড়াইবার জন্যই হয়তো সে চতুর্দ্দিক দিয়া আয়োজন করিয়া রাখিতেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আজ তার পলাইয়া যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

রুবি কহিল, কত বড় অন্যায় বলুন দেখি। নিতান্ত মেয়েছেলে বলেই কি এ অন্যায় লিলিদিকে মুখ বুজে সইতে হবে?

মৃন্ময় মনে মনে যাহাই ভাবুক না কেন প্রকাশ্যে তাহার আভাসমাত্রও দিল না। বরং একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিল, আপনি কি আপনার দাদার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে এ অনুযোগ দিচ্ছেন? লিলির সঙ্গে ইতিমধ্যে আপনার দেখা হয়েছে কি?

রুবি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল, এর পরেও তাকে কখনও মুখ দেখানো যায় মৃন্ময়বাবু! ক্ষণকাল থামিয়া তেমনি উত্তেজিত

কণ্ঠে রুবি বলিয়া চলিল, আমি লিলিদিকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। তার সম্ভ্রমকে কিছুতেই ধুলোয় লুটাতে দেব না, দাদার নামে আমি কেস করাব। হোক সে আমার ভাই। তাকে আমি বাধ্য করাব লিলিদিকে গ্রহণ করতে। এ ছেলেখেলা নয়।

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে বলেই একথা বলতে পারছেন। আমার বিশ্বাস লিলি আপনার কথায় রাজী হবেন না। তিনি যদি বুদ্ধিমতী হন, সম্মত হতেও পারেন না। কারণ যে ঘটনাটা চেষ্টা করলে একটা সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে তা ছড়িয়ে পড়বে সর্ব্বত্র, আলোচিত হবে চায়ের দোকানে, জানা-অজানা লোকের মুখে মুখে···

রুবি কহিল, আপনি বলতে চান কি ?

মৃন্ময় কহিল, বলতে আমি কিছুই চাই না। তবে আমার বিশ্বাস লিলি তাঁর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবেন। অন্ততঃ আমাদের চেয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ঢের বেশী বোঝেন। আমি বলি আপনি একবার লিলির সঙ্গেই বরং দেখা করুন। খামোকা হৈ-চৈ করবেন না। তাতে লিলির ভাল করতে গিয়ে মন্দ করে বসবেন।

রুবি -পুনরায় রুখিয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি বলতে চান যে, একজনের খামখেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে আর একজন অন্যায় এবং অসম্মানের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেবে !

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, তাই যদি হয় তা হলেই বা করবার আছে কি ! সামাজিক জীব যখন আমরা।

রুবি কহিল, যে সমাজ মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে সহায়তা করে না তারই দোরগোড়ায় মাটী আঁকড়ে পড়ে থাকবার কিসের প্রয়োজন !

মৃন্ময় কহিল, দেখুন এসব তর্কবিতর্ক এখন না তোলাই ভালো। বর্ত্তমানে আমাদের প্রশ্ন সমাজ নিয়ে নয় ; তার চেয়ে দেখুন সত্যি সত্যিই আপনি কিছু করতে পারেন কিনা।

রুবি কহিল, তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমারও নেই। কথাটা আপনি তুলেছেন বলেই বললাম। একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, সমাজের কথা ছেড়ে দিয়ে ন্যায় অন্যায়ের কথাটাই যদি ধরা যায় তা হলেও কি এর প্রতিকার করাটা আপনি অন্যায় মনে করেন ?

মৃন্ময় কহিল, আমার মতামত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ন্যায় অন্যায়, ভালমন্দ নিয়েও আমি কিছু বলতে চাই না। মোটের উপর আপনার বক্তব্য এবং কর্ত্তব্য কি সেই কথাই বলুন।

রুবি কহিল, সেই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু আপনিই সব গোলমাল করে দিচ্ছেন। অবশ্য এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমার লজ্জা থাকলেও কুণ্ঠিত হওয়া বা দ্বিধা করা উচিত নয়, নইলে আজ দাদার অন্যায় আচরণে আমায় মাটির তলায় মুখ লুকোতে হ'ত। দাদার চিঠিখানা আজ এক সপ্তাহের উপর হ'ল পেয়েছি। মাকে জানাই নি—জানাবও না। অথচ একেবারে চুপ করে থাকাও চলে না। যদিও আমি জানি যত বড় ক্ষতিই দাদা লিলিদির করুক না কেন, সে কখনও মুখ খুলবে না।—রুবি থামিল। মৃন্ময় কথা কহিল না। নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

রুবি পুনরায় বলিতে লাগিল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করবে না বলেই কি সবাই চুপ করে থাকবে। মিথ্যাটাকেই সকলে জানবে—সত্য চিরদিনই গোপন থেকে যাবে।

মৃন্ময় একটু হাসিল, কহিল, আমি ত এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বলছি, কিন্তু আপনি যে কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। মিথ্যাটাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ করে শেষে সত্যকেই যে আর খুঁজে পাবেন না।

রুবি কহিল, আমার প্রগল্‌ভতা আপনি মাপ করবেন। ক্রমাগত একই কথা ভেবে ভেবে ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না কোন্ পথে আমায় চলতে হবে।

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, আমি কিন্তু আবার বলছি আপনাকে লিলির সঙ্গে পরামর্শ করতে। ব্যাপারটাকে যত গুরুতর আপনি মনে করছেন আসলে হয়তো ততটা নয়। আর যদি আপনি নিশ্চিত জানেন যে, অন্যায়টা আপনার দাদার, তা হলে তাঁকেও কথাটা জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিন।

রুবি কহিল, তাতে সত্যিকার কোন কাজ হবে না মৃন্ময়বাবু। এতটুকু মনুষ্যত্ব যদি তার থাকত তবে লিলিদিকে টেনে এনে জনতার হাটে দাঁড় করাত না। আজ আমার গভীর লজ্জা যে সুনির্ম্মল আমার বড় ভাই। কিন্তু যাক এ সব কথা। আমি আপনার কথামতই কাজ করব। লিলিদির কাছে কালই যাব। কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

মৃন্ময় কহিল, আছে বৈকি। কারণ এর মধ্যে মাথা গলানো আমার পক্ষে যেমন অশোভন তেমনি রুচি-বিরুদ্ধ। আপনি এত বোঝেন আর এই সোজা কথাটা বুঝলেন না। আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারাই ঠিক করবেন। আমার সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয় তো দূরের থেকেই তা করব।

রুবি কহিল, কিন্তু ভুলে যাবেন না যে, আপনার উপর একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন, তার মান-সম্ভ্রম সব কিছু নির্ভর করছে।

মৃন্ময় কহিল, আপনি সহজ কথাকে জটিল করে তুলছেন কিন্তু। আমার উপর কারুর ভবিষ্যৎ অথবা সম্ভ্রম নির্ভর করে না। ঘটনাচক্রে আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি বলেই আমার কোন দায়িত্ব থাকতে হবে এ একটা কথাই নয়।

মৃন্ময় একটু থামিয়া কতকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, এ আপনাদের রাতারাতি অতি আধুনিক হয়ে উঠবার কুফল, তাই ফলভোগেরও প্রয়োজন আছে। নইলে এ ধরণের ব্যাপার অভাবিতও নয়, আকস্মিকও নয়। কিন্তু আর না. আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছি।

মৃন্ময় একটু লজ্জিত হইয়াছে এবং এই লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই অকস্মাৎ চলিয়া গেল। রুবি একটা কথা পর্য্যন্ত কহিবার অবকাশ পাইল না।

রুবিদের ওখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মৃন্ময় সরাসরি হোষ্টেলে গেল না। এত দিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত মনটা কোথায় আজ লঘু আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইবে, না কোথা হইতে এক অনাবশ্যক চিন্তা আসিয়া তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে। ইচ্ছা করিলেও এ দায় সে এড়াইতে পারে না। যত দুর্ব্বলতা তার এইখানে। অথচ এমনি মজা যে নিজের এই দুর্ব্বলতার কথা তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু গায়ে পড়িয়া দায় ঘাড়ে লওয়ায় এক প্রকার আনন্দ আছে—নেশার আকর্ষণের মত। মৃন্ময়েরও কতকটা তাই।

১৪

মৃন্ময় ট্রামে চলিয়াছে। কথায় কথায় রুবিদের ওখানেই তার অত্যন্ত দেরি হইয়া গিয়াছে। হোষ্টেলের একটা নিয়ম-কানুন আছে, মানিয়া চলিতে হয়।

হোষ্টেলে ফিরিয়া মৃন্ময় নান্টুর একখানা চিঠি পাইল। সেদিকে মন দিবার মত অবস্থা তখন তার নয়। ওদিকে খাবার ঘণ্টা দিয়াছে।

মৃন্ময় কয়েক মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু খাইতে বসিয়াও সে অন্যমনস্কভাবে সুনির্ম্মলের কথা ভাবিতেছিল, তর্কের খাতিরে যাহাই সে রুবিকে বলুক না কেন। রুবির অনুমানই তারও সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। রুবি সুনির্ম্মলের বোন। ভাবিতেও কেমন লাগে।

দেবল মৃন্ময়ের এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, আজকের পরীক্ষা কেমন হ'ল মৃন্ময়বাবু?

মৃন্ময় এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকিত হইল, মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া কহিল, কেন ভালই? পরে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আনমনা ছিলাম, তাই হঠাৎ চমকে উঠলাম।

দেবলও হাসিয়া কহিল, বাড়ীর কথা ভাবছিলেন বুঝি? এতদিন ত আপনার ভাববার অবকাশও ছিল না। আশ্চর্য্য একাগ্রতা আপনার।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। নান্কুর চিঠিখানা ঘরে টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। আজ সকালবেলা মঞ্জুরও একখানা চিঠি সে পাইয়াছে। কক্সবাজার হইতে লিখিয়াছে। আগাগোড়াই মামুলি কথায় পূর্ণ। যথাঃ—মায়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় নাই। তাহারা হয়তো আর বেশী দিন ওখানে থাকিবে না। ইতিমধ্যে তার পরীক্ষা শেষ হইয়া থাকিলে একবার কক্সবাজার আসিলে মা বড় খুশী হইবেন। সে নিজে একটুও না…এমনি আরও কত কথা। মঞ্জু বড় সহজ। ওকে বুঝিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। কিন্তু নান্কু তো চিঠি লেখে না—যেন গল্প ফাঁদিয়া বসে।

মৃন্ময় চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল :—

"বহুদিন পরে আবার তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। আমার বেদনা এবং আনন্দ এ দুয়ের কোন কিছু থেকেই তোকে বঞ্চিত করতে চাই না। আজ যথার্থই আমার বড় আনন্দের দিন। আমার ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত মনটা হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। তোকে এর আগের চিঠিতেই জানিয়েছি যে, এখানে আমি একটি ভাই এবং একটি বোন পেয়েছি। বোনটির সকল দায়িত্ব আজ আমার উপর। দাদা গেছেন আমেরিকায়। আমরা এসেছি ওয়ালটেয়ারে। আর শ্রীমতী লীলা রাও হয়েছেন মিসেস্ চক্রবর্ত্তী। তুই হাসিস নে, এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। বাস্তবিকই না। আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ নিয়ে লোকে অশোভন আলোচনা করবে এ আমরা চাই না। অথচ এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমরা শুধু লোকের মুখ বন্ধই করি নি, তাদের কাছ থেকে রীতিমত সম্মান আদায় করে নিচ্ছি। কিন্তু মনে আমাদের কোন গলদ নেই। একথা পূর্ব্বের চেয়ে জোর গলায় আজ আমি বলতে পারছি।

ফিরোজ ম্যানসনে বাসা বেঁধেছি। সমুদ্রের ঠিক পাশেই। দিবা-রাত্র সমুদ্র-বারির উন্মত্ত গর্জ্জন শুনে শুনে কেমন যেন বিরক্তি ধরে গেছে। সমুদ্রের অবস্থা এখন বড় অশান্ত।

আমরা একই ঘরে আলাদা রাত কাটাই। লীলার নির্ভরতায় ফাঁকি নেই। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ওর সুপ্ত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মর্য্যাদা দিয়ে লীলা কেমন করে আমার মত একটা উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে আগাগোড়া বদলে দিয়েছে। নিজের উপর আমার বিশ্বাস এসে গেছে।

লীলা বড় চঞ্চল। হরিণীর মত চঞ্চল; অথচ তেজস্বিনী। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমায় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। পাশের ফ্লাটের মিঃ আয়েঙ্গার প্রায়ই আমাদের চায়ের টেবিলে নিমন্ত্রিত হন। লীলা ইচ্ছা করেই ডেকে পাঠায়। আয়েঙ্গার এসে হাজির হন। মিসেস চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে কত রহস্যের সৃষ্টি করেন। লীলা হেসে গড়িয়ে পড়ে। আয়েঙ্গার অপ্রস্তুত হয়ে চলে যান, কিন্তু আবার আসেন।

আমি বলি, এ সব কেন লীলা !

লীলা বলে, লোকটা বড় হ্যাংলা, তুমি কিছু জান না নান্কু !

আমি বলি, জেনে আমার দরকারও নেই। কিন্তু মিথ্যা ও লোকটাকে ক্ষেপিয়ে লাভ কি !

লীলা বলে, এ এক ধরণের আনন্দ নান্কু। তুমি এসব বুঝবে না।

জানি না কেন লীলা আয়েঙ্গারকে নিয়ে এমন করে নাচাচ্ছে। লীলাকে বলি, এসো আমরা এখান থেকে কোথাও চলে যাই। লীলার তাতেও কোন আপত্তি নেই। বলে, তুমি যখন সঙ্গে আছ যেখানে খুশী চল। পাগল আর কাকে বলে। কিন্তু বুক আমার ভরে ওঠে। বিদেশে আত্মীয়বন্ধুবিহীন অবস্থায় লীলা আমায় চারিদিক থেকে পরমাত্মীয়ার মত ঘিরে রেখেছে। আমার জীবনের মরা গাঙ্গে আবার জোয়ার এসেছে। কিন্তু তাতে ঘোলা জলের আবর্ত্ত নেই—স্বচ্ছ সুনির্ম্মল।

আজ আমার কি মনে হয় জানিস্। তোদের মত শান্তশিষ্ট ভাল ছেলে না হয়ে জীবনে আমি ঠকি নি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ পেয়েছি। কোথাও টিকে যেতে পারি নি বটে, কিন্তু অনির্দ্দিষ্টের মধ্যে নিজের জীবন সম্বন্ধে যে উপলব্ধি আমার হয়েছে তার মূল্য চলার পথে বড় কম নয়। সে যাই হোক—এসব কথা আজ থাক। এর পরে দু-চারটে মামুলি খবরাখবরের পর আজকের মত বিদায় নেব।

তোর চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করেছি। লিখবার মত কিছু সংগ্রহ করা চাই তো !

লিখেছিস, মঞ্জু আমার চিঠিটা হজম করেছে। করলেই বা ক্ষতি কি ! ওরা কক্সবাজার থেকে ফিরে এসেছে কি ? আশা করি, মঞ্জুর মায়ের শরীর এখন ভালই আছে। চিঠির জবাব দিস্। ইতিমধ্যে অন্য কোথাও গেলে তোকে জানিয়ে যাব। —নান্কু"

মৃন্ময় চিঠিখানা হাতে করিয়াই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। যে বিশ্বাস নান্টুকে মানুষ হইয়া উঠিতে সহায়তা করিয়াছে সেই বিশ্বাসই আর একজনকে শুধুমাত্র খেয়ালের খোরাকই যোগাইয়াছে। বুকে জাগাইয়া তুলিয়াছে লোলুপতা, পাশবিক আদিম ক্ষুধা। খাসা নাম—সুনির্ম্মল। নাম তার সার্থক হইয়াছে।

টাইমপিসটা টিক টিক করিয়া অবিরাম বাজিয়া চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে গভীর স্তব্ধতা। পাশের বিছানায় রুমমেট অকাতরে ঘুমাইতেছে। সম্মুখে থানা-প্রাঙ্গণের দেবদারু গাছে বাদুড়ের ঝাঁক। তাদের পাখার শব্দ, এবং মাঝে মাঝে দ্রুতগামী মোটরের আওয়াজ স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে যেন জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া তোলে। মৃন্ময়ের কোন দিকে হুঁস নাই। তার মাথার মধ্যে তখন অজস্র প্রশ্নের নীরব আনাগোনা চলিয়াছে।

ঠিক কথা—সহজ এবং অতি সাধারণ কথা। ঘটনা এক হইলেও মানুষের মনের উপর তাহা নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নহিলে নান্টুর জীবনের ধারা আজ ভিন্নমুখী হইত। কিন্তু লিলি মেয়েটিই বা কেমন? তাহাকে দেখিলে ত সাধারণ মেয়ে বলিয়া মনে হয় না, বরং শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয়। সে কেন এমন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে টানিয়া আনিল। তার শিক্ষা, তার সংস্কার শেষ পর্য্যন্ত একটা খেয়ালের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া আত্মহত্যা করিল। এই নিরভিমান মেয়েটি সম্বন্ধে কি উদার মনোভাবই না তার ছিল।

মৃন্ময় ভাবিতেছিল, মানুষের মনের আদিম প্রবৃত্তিটাই কি এত বড় হইয়া উঠিল যার কাছে শিক্ষা, সংস্কার, শ্লীলতা সব কিছু ম্লান হইয়া গেল। সংযম শুধুই কি একটা কথার কথা!

রাত অনেক হইয়াছে। মৃন্ময় সহসা আত্মস্থ হইল। অকারণে সে এসব কি ভাবিতেছে। কালই সে টিকিট কাটিবে। রুবি অসন্তুষ্ট

হইবে? তাহাতে মৃন্ময়ের কিছুই আসিয়া যাইবে না। উহাদের ভালমন্দর বোঝা সে কেন বহন করিতে যাইবে।

মৃন্ময় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল এবং এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরদিন বাস্তবিকই সে টিকিট কাটিতে পারিল না। বরং বিকাল হইতেই রুবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের ঘরেই তার সাক্ষাৎ মিলিল, কিন্তু সে একলাই নয়, লিলিও সেখানে ছিল। যদিও সে লিলির উপস্থিতি আশা করে নাই তথাপি বিস্মিত হইল না। মৃন্ময় মুখে কিছু না বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। লিলির পূর্ব্বের চেহারা আর নাই। অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট তার মুখভাব। কিন্তু লজ্জার এতটুকু আভাস তার কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মৃন্ময় রীতিমত বিস্মিত হইল।

রুবিই প্রথমে কথা কহিল, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন শুনে লিলিদি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন মৃন্ময়বাবু। তারপর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনারা বসুন, আমি দু' মিনিটেই আসছি। রুবি চলিয়া গেল।

মৃন্ময় কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু লিলির কোন ভাব-পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বরং সে-ই প্রথমে কথা কহিল, রুবির কাছে হয়তো আপনি অনেক কিছু শুনেছেন। কিন্তু তা নিয়ে আমার বলবার কিছু নেই। লোকে যত নিন্দেই করুক, আমি জানি অন্যায় আমি কিছুই করিনি। অবশ্য আমার এ কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক। তবে এটুকু আমি বুঝেছি যে, আমার নিজের ভার আমাকেই বইতে হবে, সেখানে আর কারুর সাহায্য চাইতে আমি পারব না। কিন্তু আপনি অনাত্মীয় হয়েও আমার দুর্দ্দিনে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। অথচ···লিলি কথার মাঝে সহসা থামিয়া

গিয়া অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল। মৃদু কণ্ঠে সে কহিল, আমার নিজের পথ আমি ঠিক করে নিয়েছি। আপনি মোটামুটি কিছু সাহায্য করলেই যথেষ্ট হবে। আমি বিদেশে চাকরি নিয়েছি। আপনি শুধু আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

লিলি পুনরায় থামিল, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, আপনার উপর হয়তো জোর করে অত্যাচার করা হচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন উপায় আমি খুঁজে পাই নি।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না—সত্যিকারের ঘটনাটা কি? বুঝে আমার দরকারও নেই, কিন্তু তবুও আমার মন বলে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি রয়ে গেছে, ইচ্ছে করলেই যার প্রতিবিধান হতে পারে।

লিলির মুখে ঈষৎ ম্লান হাসি দেখা দিল। সে শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল, তা হয়তো পারে। কিন্তু যেখানে মনের ফাঁক বুজল না সেখানে ফাঁকি ধরে লাভ কি মৃন্ময়বাবু।

রুবি ফিরিয়া আসিয়াছে। লিলি উঠিল, কহিল, আজ আমি যাই মৃন্ময়বাবু। পরশু আমি রওনা হব ঠিক করেছি। নিয়োগপত্রও ইতিমধ্যে পেয়েছি। দার্জিলিং মেল ধরতে হবে। রুবির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া তেমনি শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, তোমাকে ধন্যবাদটা আর দিলাম না। তবে তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তোমার জোড়া সত্যি মেলে না।

রুবির মনোভাব মুহূর্ত্তের জন্য বদলাইয়া গেল। কিন্তু চোখের পলকে আত্মসংবরণ করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, এখুনি যাবে লিলিদি। আমি যে তোমার চা দিতে বলে এলাম।

লিলির চোখে মুখে এক বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি দেখা দিল। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তোমরা অনুরোধ করেছ বলেই ত আমি তা গ্রহণ করতে পারি না রুবি। অধিকার বলেও একটা কথা আছে, মন বলেও একটা পদার্থ আছে, যাকে কোন অবস্থায় অস্বীকার করা চলে না।

লিলি আর দাঁড়াইল না।

মৃন্ময় অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, অদ্ভুত মেয়ে—

রুবি কহিল, তার চেয়েও বিস্ময়কর লিলিদির মনের জোর। এত বড় যে একটা ঘটনা ঘটল অথচ তা যেন ওকে কিছুমাত্র নোয়াতে পারে নি।

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, হয়তো তার নত হবার মত কোন কারণও নেই।

রুবি চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ধীর কণ্ঠে কহিল, আমি ত আপনাকে বরাবরই বলে আসছি যে লিলিদি অতল সমুদ্র, ওকে বুঝতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, এ ব্যাপারে কেউই আপনারা কম যান না। অবশ্য আপনাদের কাউকে খুঁটিয়ে বুঝবার প্রয়োজনও আমার নেই। ঘটনাচক্রে আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি। বাধ্য হয়ে খানিক সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিনের জন্যও আপনাদের মধ্যে আমায় পাবেন না। সে যাই হোক আজ আমি যাই।

রুবি স্মিতহাস্যে কহিল, এসেই আপনি উঠি উঠি করেন কেন বলুন ত! আমাদের বুঝি সহ্য করতে পারেন না।

মৃন্ময় কহিল, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেন নি আপনি। পাড়াগাঁয়ের লোক কিনা—হঠাৎ আপনাদের মধ্যে এসে দিশেহারা হয়ে

পড়েছি। আপনাদের সমস্তরের হলে হয়তো উঠতেই চাইতাম না। জোর করে তাড়াতে হ'ত।

রুবি হাসিয়া ফেলিল, আপনি আমাদের কি মনে করেন বলুন ত!

মুখে রুবি যাহাই বলুক না কেন, অন্তরে অন্তরে সে খুশী হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, তাদের আলোচনাটা একটা সহজ পরিহাসের পথে ফিরিয়া আসিয়াছে। লিলি সম্বন্ধে মৃন্ময় আজ যে ভাবে কথাবার্ত্তা স্নুরু করিয়াছে তাহাতে রুবি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল কি জানি কোন্ কথায় কি কথা আসিয়া পড়িবে। লিলির সহিত দেখা হইবার পর হইতেই মৃন্ময়ের কথার ভঙ্গী কেমন যেন বাঁকা পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

মৃন্ময় সহসা রুবিকে প্রশ্ন করিল, আপনাকে যেন একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে।

এই আকস্মিক প্রশ্নে রুবি চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সহজ কণ্ঠে কহিল, আমার চিন্তিত হওয়া কি খুবই অস্বাভাবিক মৃন্ময়বাবু? আজ ক'মাস ধরে ক্রমাগত শুধু ভাবছি। ভেবে ভেবে কূল পাই নি। অথচ যাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা সে কত অনায়াসেই না একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছেছে। আমরাও যে প্রয়োজন হলে কত শক্ত হতে পারি তার প্রমাণ একটু আগেই পেলাম। তাইতো ভাবছিলাম কি ভাগ্যি যে আপনাকে পেয়েছি, নইলে এই নিয়ে আমি হয়তো ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলতাম।

মৃন্ময় হাসিমুখে রুবির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কোন জবাব দিল না।

রুবি কহিল, আপনি হাসছেন, কিন্তু আমি একবিন্দু মিথ্যে বলি নি।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখেই কহিল, না আপনি খুব সত্যবাদী।

রুবির দুই চোখে বিস্ময়! মৃন্ময় বলিতে চায় কি! তার এত উদ্যোগ-আয়োজন সবই কি এই লোকটি ব্যর্থ করিয়া দিবে। মৃন্ময়ের আজিকার ইঙ্গিতগুলি কেমন যেন অর্থপূর্ণ। শেষ পর্য্যন্ত ঘাটে আসিয়া কি ভরাডুবি হইবে?

ভরা কিন্তু ডুবিল না।

মৃন্ময় তার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।

১৫

যাত্রার পূর্ব্বে কাজটা যত জটিল বলিয়া মৃন্ময়ের মনে হইয়াছিল আসলে তাহার কিছুই হইল না। মৃন্ময় দাদা—লিলি তার ছোট বোন, সদ্য স্বামী হারাইয়াছে। মিথ্যা···হোক মিথ্যা—এমন কত মিথ্যাই ত সত্য হইয়া জগতে টিকিয়া আছে। কে তাহার খোঁজ নেয়।

অমাবস্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ীখানা নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। লিলি জড়সড় হইয়া শুইয়া আছে। নিদ্রিত কিংবা জাগ্রত তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। মৃন্ময় একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। মায়া হয়। কত বড় দুশ্চিন্তা লইয়া ঐ মেয়েটি দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাইয়া দিয়াছে। আজ যদিই-বা একটা কূলের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কে বলিতে পারে সেখানেও স্থিতিলাভ করিতে পারিবে কিনা! অমন নির্ম্মল স্নিগ্ধ মুখখানিতে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ সুপরিস্ফুট। তথাপি ওর সহজ সৌন্দর্য্য এবং স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এতটুকু ব্যাহত হইয়াছে মনে হয় না।

লিলির পরনে একখানি সরুপাড় ধুতি। হাতে দুই গাছা করিয়া সোনার চুড়ি। এ ছাড়া আর অন্য কোন সোজা পথ তাদের চোখে পড়ে নাই। মৃন্ময় মৃদু আপত্তি তুলিয়াছিল। লিলি বাধা দিয়া বলিয়াছে, আমার উপযুক্ত বেশভূষাই হয়েছে মৃন্ময়বাবু।

রক্ষা এই যে লিলি অবাঙালীর মধ্যে চলিয়াছে। নইলে কোন্ পথে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিত তার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইত। মৃন্ময় নিজেও বড় কম বিস্মিত হইল না তার নিজের এই মানসিক চাঞ্চল্যে। লিলি তার কে? তার সম্বন্ধে এত দুশ্চিন্তাই বা কেন? মৃন্ময়ের মন বলে, এগুলি মানুষের সহজ বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ।

মৃন্ময় জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ট্রেনের মধ্যে তার ঘুম হয় না। এঞ্জিনের বাঁশী তীব্র রবে বাজিয়া উঠিল। হয়তো কাছাকাছিই কোন ষ্টেশন। ট্রেনের গতিও হ্রাস পাইয়াছে, লোকালয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন। দু'একখানি কুঁড়েঘর ও মিট্‌মিটে আলোর রেখা ক্ষণে ক্ষণে নজরে পড়িতেছে। গাড়ী-কিন্তু দাঁড়াইল না। পুনরায় তার গতি দ্রুত হইয়া উঠিল। মৃন্ময় অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছে। ওদিকে লিলি যে বহুক্ষণ হইল উঠিয়াছে তাহা সে টের পায় নাই। সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, আপনি কতক্ষণ উঠেছেন?

লিলি কহিল, অনেকক্ষণ। শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। কিন্তু আপনি বুঝি সেই থেকেই বসে আছেন।

মৃন্ময় কহিল, ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। আপনার খানিকটা হয়েছে ত?

ঘুম! লিলি একটুখানি হাসিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, হয়েছে বৈকি। লিলি থামিল, কিছুক্ষণ মৌনভাবে কি চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল,

আপনাকে আমার গোটাকয়েক কথা বলবার ছিল। আর হয়তো সুযোগ পাব না। আপনার এখন সময় হবে কি?

মৃন্ময় কহিল, বিলক্ষণ! সময় কাটাবার ভাবনার হাত থেকে তা হলে বেঁচে যাই যে।

লিলি কহিল, আমি রুবির কথা আপনাকে বলতে চাই। আমি জানি আমার সম্বন্ধে সে সত্যিমিথ্যে অনেক কিছু আপনাকে বলেছে। অনেক ভেবেই আমি প্রতিবাদ করি নি। নিজের যতটা ক্ষতি হবার, তা তো হয়েছেই তার উপর আর নূতন করে কথা কাটাকাটি করবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তা ছাড়া একজন পুরুষমানুষের সাহায্যের প্রয়োজন আমার ছিল। বহু খবরের মধ্যে সুনির্ম্মলের সঙ্গে আমার বিয়ের খবরটা রুবি নিশ্চয় আপনাকে দেয় নি।

মৃন্ময় প্রায় লাফাইয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি বলছেন!

লিলি কহিল, সত্যি কথাই বলেছি। আপনি চমকে উঠছেন কেন। আইন আমার কথার সাক্ষ্য দেবে।

মৃন্ময়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ আপনি বিনা প্রতিবাদে এত বড় একটা মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় তুলে নিলেন!

লিলি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, মাথা পেতে না নিয়ে আর কি করতে পারি আপনিই বলুন! মামলা-মোকদ্দমা করব? কিন্তু তাতে লাভ হবে কি। খামোকা মিথ্যেটাকেই আরও জীইয়ে রাখা হবে। তা ছাড়া যে লোক এত বড় প্রতারণা করতে পারে সে যে এত সহজে আমাকে মুক্তি দিয়েছে এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আজীবন আমাকে এক মিথ্যাচারী প্রবঞ্চককে নিয়ে দিন কাটাতে হবে না। সহজ ভাবে অন্ততঃ নিঃশ্বাস ফেলতে পারব।

লিলি ক্ষণকাল থামিয়া পুনরায় কহিল, আপনাকে মিথ্যে বলব না মৃন্ময়বাবু। গোপনতার দিন আমার চলে গেছে। আপনি কি মনে করেন সুনির্ম্মলকে ঘাঁটাতে গেলে সে জয়ঢাক পিটিয়ে আমার সুনাম প্রচার করবে। সে বরং আরও নানা হীন ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে চালাবে। এক দিনের মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের চিন্তায় আমি আজ একথা বলছি না। দিনের পর দিন ক্রমাগত ভেবে ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সুনির্ম্মল অমানুষ বলেই সব মিথ্যার বোঝা আমায় মাথায় তুলে নিতে হয়েছে। আমি কি কিছুই বুঝি না মৃন্ময়বাবু!

মৃন্ময় মুখ তুলিয়া চাহিল। ক্ষীণ প্রতিবাদের কণ্ঠে কহিল, কিন্তু……

লিলি বাধা দিয়া কহিল, মিথ্যা যুক্তি দেখাবেন না মৃন্ময়বাবু। যে বিশ্বাস একবার হারিয়ে ফেলেছি তা তো আর ফিরে পাব না। তা বলে আপনি মনে করবেন না যেন আপনাকেও আমি ভুল বুঝেছি, বরং আজ আমার মস্ত বড় ভরসা এই যে, আপনাকে আমি বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত, আমার চরম সঙ্কটের দিনে কাছে পেয়েছি।

মৃন্ময় নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি আর কিছু ভাবছি না, কিন্তু রুবি আমার সঙ্গে এ ছলনা করলে কেন। কতটুকু লাভ তার এতে হয়েছে? আপনাকে মিথ্যে বলব না লিলি দেবী—রুবির সম্বন্ধে আমার খুব ভাল ধারণাই ছিল। অন্ততঃ এসব নোংরামির মধ্যে তার হাত নেই বলেই বিশ্বাস করেছিলাম।

লিলি কহিল, এর থেকেই রুবিকে অতটা ছোট ভাবছেন কেন? আমারও ভুল হতে পারে ত। তা ছাড়া পারিবারিক স্বার্থের জন্য হয়ত তাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এমনও ত হতে পারে

যে, সে তার নিজের ইচ্ছায় চলে নি। কাউকেই আমি আর দোষ দিতে চাই না মৃন্ময়বাবু। অপরাধ যা তা আমারই একলার, নইলে আজ আমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলকে ত্যাগ করে এমন ভাবে আত্মগোপন করতে হবে কেন?

মৃন্ময় অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, না এ কিছুতেই হতে পারে না। এমনি ক'রে পালিয়ে গিয়ে সবাইকে শুধু মিথ্যেটাই জানতে দেবে, আর সত্যিকারের অপরাধী যারা তাদের গায়ে এতটুক আঁচ লাগবে না এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। তোমাকে আদালতের সাহায্য নিতে হবে। যা সত্য তা আর দশজনকে জানতে দিতে হবে।

মৃন্ময়কে বাধা দিয়া লিলি কহিল, আদালতের ডিগ্রির জোরে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণিত করতে হবে মৃন্ময়বাবু! লিলি বারকয়েক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, এ হতেই পারে না। আমি তা পারব না। আমাকে ক্ষমা করুন আপনি।

মৃন্ময় কহিল, আমার কথামত কাজ করলে হয়ত আরও বহু দুর্ভাগা মেয়েকে আপনি ঐ শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন। আমার কথাটা একটু ভাল করে ভেবে দেখে না হয় পরে এর জবাব দেবেন। কিন্তু আমি ভাবছি একথা আমায় কলকাতায় জানালেন না কেন?

লিলি মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাতেই বা কি লাভ হ'ত। কতগুলি বাজে কথা কাটাকাটি ছাড়া কোন উপকারই আমার হ'ত না। তা ছাড়া তখন হয়ত আমার কথা আপনিও বিশ্বাস করতেন না।

মৃন্ময় শান্তকণ্ঠে কহিল, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আপনার কিছুই এসে যেত না। বিশেষ করে আপনার বিয়ের অত বড় প্রমাণ যখন রয়েছে।

লিলি কহিল, আমি হয়ত অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, কিন্তু যেখানে প্রকৃত ভালবাসা নেই সেখানে এ মিথ্যের বেসাতি করে কোন লাভই হ'ত না। মন বলে যে সুনির্ম্মলের কোন বস্তুই নেই, এ আগে জানলে এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা কখনই ঘটত না।

লিলি ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু সুনির্ম্মলের চিঠিখানা কি আপনি পড়েন নি? যে নিজের একটা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য এত বড় কলঙ্কের বোঝা বিনা দ্বিধায় আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে সে প্রয়োজনমত যে আরও নীচতার আশ্রয় নেবে না এমন ভরসা কি আপনি দিতে পারেন? আপনি কি জানেন সুনির্ম্মল বিলেত যায় নি—কাছাকাছি থেকেই অবস্থাটা লক্ষ্য করে চলেছে?

মৃন্ময় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেও নীরব রহিল। তার চোখের সম্মুখে যেন ছায়াচিত্রের অভিনয় চলিয়াছে।

লিলি পুনশ্চ কহিল, আমার মনে হয় আপনি আমার অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি তাই একথা বলছেন। আমি বিপদকে বরণ করে নিয়েছি—আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। আমি বাঁচতে চাই মৃন্ময়বাবু।

লিলির কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুইটাও অশ্রুভারে টল টল করিতেছিল। উভয়েই নীরব। শুধু চলন্ত ট্রেনের অবিশ্রাম একঘেয়ে শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। মৃন্ময় পুনরায় বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইল। নীরন্ধ্র অন্ধকার। সীমাহীন অন্ধকারের মহাসমুদ্র যেন। সহসা লিলির পানে মৃন্ময় চাহিয়া কহিল, কিন্তু বড় দুঃসাহসিকা আপনি।

লিলি কোন জবাব দিল না। মৃন্ময়ও আর কথা বাড়াইল না। উহাদের লইয়া সে তার অনেক মূল্যবান সময়ের অপচয় করিয়াছে, কিন্তু আর নয়। তা ছাড়া কথাটা লিলি নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। তাহাকে

হয়ত আরও গভীর ষড়যন্ত্রের জালে ফেলিয়া লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িত। হয়ত দাঁড়াইবার মত কোন অবলম্বন লিলি আর খুঁজিয়া পাইত না। এ বরং কতকটা সে ভালই করিয়াছে। কিন্তু কি অপদার্থ এই স্থনির্ম্মল!- মেয়েদের জীবন লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলা খেলিতে তার বিবেকে বিন্দুমাত্র বাধিল না। নিজের সৃষ্টিকে সে দ্বিধাহীন চিত্তে অস্বীকার করিয়া বসিল। মনুষ্যোচিত কোন স্বাভাবিক চেতনা কি তার মধ্যে নাই। খেয়ালটাই কি তার জীবনে এত বড় হইল, যার কাছে বিবেক-বুদ্ধি পর্য্যন্ত তলাইয়া গেল।

স্থনির্ম্মলের কাছে লিলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তার সম্বন্ধে যতটুকু ঔৎসুক্য তাহা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থনির্ম্মল তাহাকে বাতিল করিয়াছে। বোকা মেয়ে নিজেকে এত বেশী সস্তা করিতে গিয়েছিলে কেন?

গাড়ী কি একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

১৬

মৃন্ময় কহিল, ভোর হতে এখনও ঢের দেরি। আপনি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিন্ না।

ঘুমাইবার আগ্রহ লিলির দেখা গেল না। সে পুনরায় বলিল, আমার দুর্ভাগ্যের কথা কাউকেই জানাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু আমিও তো মানুষ—একলা একলা এ বোঝা আর বইতে পারছিলাম না। পুনরায় লিলির দু'চোখ ঝাপসা হইয়া উঠিল। চোখের কোল বাহিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মৃন্ময় বাধা দিল না। লিলির খানিকটা

কাঁদা দরকার। নইলে অন্তরের আগুনে ওর ভিতরটা হয়তো একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে।

লিলি মৃদু কণ্ঠে কহিল, এক এক সময় আমার মনে হয়, এত যে শিক্ষার অহঙ্কার, আধুনিক সমাজে এক বিশিষ্ট ধরণে চলাফেরা, সে সব আমার রইল কোথায়। সবাই আমাকে ভুলে যাবে, শুধু ভুলবে না আমার মিথ্যা পরিচয়কে—যা একেবারেই আমার স্বরূপ নয়। নিজের কথা আর তেমন করে ভাবি না। ভাবতে ভালও লাগে না। কিন্তু ···লিলি কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল।

মৃন্ময় অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, আমার মনে হয় এক দিন সুনির্ম্মল তার ভুল বুঝবে।···

লিলি মৃন্ময়কে কথার মাঝখানে থামাইয়া দিল। তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কহিল, তাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না। আমি ভেবে পাই না এর মধ্যে আপনি সুনির্ম্মলের ভুলটা কোথায় দেখলেন। এ তার স্বভাব···লিলি থামিল। তার নীরস কণ্ঠস্বর সম্ভবত তার নিজের কানেও অত্যন্ত বেসুরো ঠেকিয়াছে। সে অপ্রতিভ হইল এবং মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, যারা না জেনে ভুল করে তাদের সঙ্গে আপোষ করা চলে, কিন্তু ভুল করাটা যাদের প্রকৃতিগত তাদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না। কিন্তু এসব কথা এখন থাক, আমি বড় ক্লান্তি বোধ করছি। আর ভাবতে পারছি না।

মৃন্ময় বিনা প্রতিবাদে পুনরায় বাহিরের পানে দৃষ্টি ফিরাইল।

পরদিন সকালে।

অল্প রোদ উঠিয়াছে। উঁচু পর্ব্বত আকাশকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দূরে নীল আকাশের গায় কে যেন অদৃশ্য হস্তে গভীরতর নীলের ধাপ কাটিয়া দিয়াছে। দু-পাশে আকাশের অসীম বিস্তার ; মাঝখানে সোজা দাঁড়াইয়া আছে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক। চতুর্দ্দিকে বনফুলের

প্রাচুর্য্য. প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে ওদের পূর্ণ বিকাশ। বেঙ্গল ডুয়ার্সে'র ছোট গাড়ী দ্রুত চলিয়াছে—কখনও আলো কখনও ছায়ার বুকে যেন একটা সচেতন স্পর্শ রাখিয়া।

মহুয়া ফুলের মন মাতাল-করা সুবাস, বনফুলের তীব্র গন্ধ বাতাসের সহিত মিশিয়া স্থানটির রূপ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছে। এক পাশে খাড়া পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে ছোট-বড় গাছের সারি। ডালপালা নাই বলিলেও চলে। নিরাভরণা বিধবার ন্যায় সর্ব্ববিধ বাহুল্যবর্জ্জিত। এও এক প্রকারের সৌন্দর্য্য। গাছের মাথায় পাতায় পাতায় রোদের ঝিকিমিকি। বনবিহগের কলকাকলি থামিয়া গিয়াছে। বেলা বাড়িতেছে।

ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে কখন মন্থর, কখনও দ্রুত গতিতে। চা-বাগানের কুলি-কামিনদের মধ্যে কাজের মরশুম পড়িয়াছে। সামনের দিকে দোলায়মান শিশুসন্তান, পিছনে লম্বাটে ধরণের বেতের ঝুড়ি। চা-পাতা সংগ্রহে হাত উহাদের সমান ভাবে চলিতেছে। ট্রেনের যাওয়া-আসার দৃশ্য উহাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাই মনে আর নূতন কোন সাড়া জাগায় না।

মৃন্ময় নীরবে বসিয়া আছে। লিলিরও কোন সাড়াশব্দ নাই। এই কামরায় ওরাই শুধু যাত্রী নয়, আরও বহু আছে—যদিও তারা বাঙালী নয়। কিন্তু মৃন্ময় এবং লিলির কথা যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। মৃন্ময় লিলির চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল যে, এত বড় দুঃখটাকে ঐ মেয়েটি কেমন করিয়া বিনা প্রতিবাদে এরূপ দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিল। অকস্মাৎ কল্পনায় লিলির পাশে আসিয়া যেন দাঁড়াইল মঞ্জুষা। মুখে তার তিক্ত বিদ্রূপভরা হাসি···চোখ দিয়া যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে আগুনের শিখা।

মৃন্ময় হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তার তন্দ্রা আসিয়াছিল, আর সেই সুযোগে মঞ্জুষা যেন তাহাকে চোখ রাঙাইয়া

গেল। মৃন্ময় একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিল—এ কি স্বপ্ন, না নিজেরই অজ্ঞাতে এই সব উদ্ভট চিন্তাকে সে মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিল আর তন্দ্রার ঘোরে সেইগুলিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সে ত' কাহাকেও ফাঁকি দেয় নাই। কিংবা কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবার চিন্তাও তাহার মনে স্থান পায় নাই। মৃন্ময় নিজেকে বার বার প্রশ্ন করে, কিন্তু উত্তর মেলে না। অথচ মনটা তাহার অকারণে ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। মনের উপর হইতে এই পাষাণ-বোঝাকে যেন কিছুতেই নামানো যায় না, বরং আরও গুরুভার হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসে। কিন্তু এসব কথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই। মৃন্ময়ের মন সহসা দেশের পথে ছুটিয়া চলে। এখানকার কাজ শেষ করিয়া আর একটি মুহূর্ত্তও সে অপচয় করিবে না।

১৭

প্রয়োজন হইলে মানুষ যে কত অবলীলাক্রমে অভিনয় করিতে পারে তার প্রমাণ আজ দুই-তিন দিন যাবৎ মৃন্ময় এবং লিলি দিয়া আসিতেছে। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই এমনি নিখুঁত এবং সহজ তাদের অভিনয়। ভাই এবং বোন—এই তাদের পরিচয়।

রাজবাড়ীর সীমার মধ্যেই বাংলো ঠিক করা হইয়াছে। বাংলোখানি ছোট হইলেও সুন্দর। সম্মুখেই একটি ফুলের বাগান, তাহাতে নানা-জাতীয় বহু পরিচিত এবং নাম-না-জানা ফুলের অপূর্ব্ব সমাবেশ। চোখ জুড়াইয়া যায়। কিন্তু মৃন্ময়ের এ জায়গাটি ভাল লাগিতেছিল না। এর

চেয়ে গ্রামের উঁচুনীচু মাটির পথ, পদ্মার জলে রোদের খেলা···পুঁটিরামের বড় দীঘিতে ছেলেছোকরাদের অবাধ বাচখেলা, কিংবা কৃষক ছেলেদের নদীর জলে মাতামাতি—এগুলিতে একটা জীবন্ত অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়। এমন কি, এই সময়ে পুঁটিরামের কাঁদুনে মেয়েটার একঘেয়ে কান্নাও যেন তার কাছে বিরক্তিকর নয়।···কিন্তু এখানকার আকাশ খণ্ডিত। স্থানে স্থানে দৃষ্টি প্রতিহত হয়। ক্ষণে ক্ষণে বন-মোরগের কর্কশ কণ্ঠস্বর নিভৃত চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মায়। এখানে তার কোন আকর্ষণই নাই, বরং একটা গভীর দুশ্চিন্তা তার চিত্তকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি এখানে দিনকয়েক তাহাকে থাকিতে হইবে। এখানে পৌঁছিয়াই লিলি শয্যার আশ্রয় লইয়াছে, জ্বর হইয়াছে—যদিও বেশী নয়। কিন্তু ভদ্রতা বলিয়া একটা কথা আছে, মন বলিয়াও একটা বস্তু আছে। লিলি অবশ্য বলিয়াছিল—সামান্য জ্বর যখন, তখন আপনাকে আর আটকে রাখা উচিত হবে না।—কিন্তু লিলি যাহাই বলুক এখানে সে তার সহোদরা রূপে পরিচিতা যার মর্য্যাদা সকলের কাছেই আছে। মৃন্ময় এখানে কোন দিক দিয়াই ত্রুটি রাখিতে চাহে না।

রাজাবাবুর ছেলে আজ শিকারে যাইবে। মৃন্ময়ের ডাক পড়িয়াছে। তার একান্ত অনুরোধ মৃন্ময় যেন তার অনুগামী হয়; নতুবা সে দুঃখিত হইবে। ইতিমধ্যে ছেলেটির সহিত মৃন্ময়ের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। চমৎকার ছেলে।

মৃন্ময়কে সে ছাড়িয়া দিতে চাহে না, বলে, এখানেই তার বাবাকে বলিয়া সে তার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে। মৃন্ময় কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারে নাই। আপাততঃ দিন-কয়েকের জন্য তার দেশে না গেলেই নয়। তার উপর পরীক্ষার ফলাফলের উপর তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

ছেলেটির ইচ্ছা সে মৃন্ময়ের কাছে ইংরেজী শেখে। কিন্তু এসব পরের কথা। সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিলেও চলিবে। আপাততঃ তাহার সহিত মৃন্ময়ের শিকারে না গেলেই নাকি নয়। মৃন্ময় আপত্তি তুলিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় নাই। লিলির অসুস্থতার সংবাদ দিবার সঙ্গে সঙ্গে নার্সের ব্যবস্থা করিবার জন্য লোক পাঠানো হইল। মোটের উপর মৃন্ময়কে আজকের দিনে তার চাই-ই। ছেলেটির সব ভাল, কিন্তু বড় একরোখা।

উহারা হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছে। সুতরাং হাতি-হাওদার প্রয়োজন নাই। মৃদু সতর্ক ওদের গতি। হরিণও অত্যন্ত সাবধানী। গাছের পাতা খসিয়া পড়ার শব্দে অদৃশ্য হইয়া যায়। আপাতত তাহারা চলিয়াছে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা পাহাড়ের গা বাহিয়া। এখানে শুধু বন-মোরগ এবং পাখী মেলে। বন-মোরগ মারা হরিণ শিকার অপেক্ষা কষ্টসাধ্য। উহাদের ডাক শুনিয়া স্থানের দিশা পাওয়া আরও শক্ত।

ছেলেটি অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। বাঘ ভাল্লুক এদিকের পাহাড়ে বড় একটা দেখা যায় না। তারা থাকে আরও নিবিড় জঙ্গলে যেখানে দিনের বেলায়ও রোদের মুখ দেখা যায় না। এমনি নিবিড়, এমনি ঘন-সন্নিবিষ্ট সেখানকার গাছপালা। সে সব পাহাড়ে ছোটবড় ঝরণার অভাব নাই। ছল ছল করিয়া ঝরণার জলধারা অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। সেখানে সব সময় শিকার সহজলভ্য। পিপাসা মিটাইতে বন্যজন্তুর ঐ গভীর বনে ঝরণা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

সহসা ছেলেটি থামিল। নাকের কাছে মৃন্ময় মিষ্ট একটা গন্ধ অনুভব করিল। কতকটা কামিনী-আতপের সুগন্ধের মত। অনুচর দু'জনকে পাহাড়ী ভাষায় কি বলিয়া সে মৃন্ময়ের উদ্দেশ্যে কহিল, একটু সাবধানে চলবেন। কাছাকাছি কোথাও পাহাড়ী সাপ বেরিয়েছে। ছেলেটি বন্দুকটা বাগাইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু সাপের সাক্ষাৎ

মিলিল না। দেখা দিল বৃষ্টি। সে তো বৃষ্টি নয়, যেন বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা কেহ তাহাদের খোঁচা মারিতেছে এমনি তার বেগ। তাহারা সিক্ত বস্ত্রে অগ্রসর হইয়া চলিল।

অল্পক্ষণেই রোদ উঠিল। এখানে রোদ এবং বৃষ্টি এমনি পাশাপাশি দেখা দেয়। এমনি সময়েই হরিণের সাক্ষাৎ মেলে। ছেলেটি খুশীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল, যেন এখুনি ভয়ানক একটা কিছু সে করিয়া বসিবে। কিন্তু একটা কিছু করিয়া বসিবার পূর্ব্বেই আর এক দিক দিয়া অবস্থা জটিল হইয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি হাসিয়া কহিল, ভয় পাবেন না, ও কিছু নয়। কিন্তু মৃন্ময় আশ্বস্ত হইতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে ছোট বড় অসংখ্য জোঁক আসিয়া জুটিয়াছে।

ছেলেটি পুনরায় হাসিমুখে কহিল, যদি গায়ের উপর—

মৃন্ময় এমন ভাবে লাফাইয়া উঠিল যে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। ছেলেটি তার পূর্ব্ব-কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সহাস্যে কহিল··· তাহলে হাতে খানিকটা থুথু মেখে ধরে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ভয়ের কোন কারণ নেই।

পুনরায় সুরু হইল উহাদের নিঃশব্দে পথচলা। অতি সাবধানে পথ চলিতে গিয়া মৃন্ময় রীতিমত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা চমকাইয়া উঠিল ছেলেটির বন্দুকের আওয়াজে। মৃন্ময় থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে খানিকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ঝপ করিয়া একটা শব্দ। পাখা ঝটপট করিয়া ভীত ও ত্রস্ত পক্ষীকুলের দ্রুত পলায়ন। তার পরে একেবারে সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে এখানে কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা মনেও হয় না।

ছেলেটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিল, শিকার পড়েছে। মস্ত হরিণ। হরিণটি সত্যই বড়। তার তখন শেষ অবস্থা। একটা যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত

আর্ত্তনাদ যেন মানুষের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইতেছে। দুটি করুণ চোখে যে মৌন বেদনার প্রকাশ রহিয়াছে মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না, তাই এই নির্ব্বাক পশুর বেদনায় নির্ব্বিকার থাকিয়া সাফল্যের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এমনি জীবন-মরণ লইয়াই সর্ব্বত্র নিষ্ঠুর খেলা চলিয়াছে। বর্ব্বর-যুগ হইতে সুরু করিয়া সভ্য জগতের কোথাও এর এতটুকু ব্যতিক্রম নাই। রুচি এবং প্রায়োগের রকমফের মাত্র। শুধু জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা—কখনও বা পশুর, কখনও বা মানুষের।

ছেলেটি হরিণটিকে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুচরদের নির্দ্দেশ দিল। ফিরিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার ভোজের একটা বিস্তারিত তালিকা সে মুখে মুখে বলিয়া গেল, মৃন্ময়কে নিমন্ত্রণ করিতেও সে ভুলিল না। ছেলেটির উচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। কবে সে পিতার সহিত হাতীর পিঠে চড়িয়া বাঘ শিকারে গিয়াছিল। কেমন করিয়া তাদের শিকারী হাতী ঘ্রাণশক্তি দ্বারা কাছে পিঠে বাঘের অস্তিত্বের আভাস পাইয়া শুঁড় আন্দোলিত করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিল; তাহার বাবা এক গুলিতে সাড়ে আট ফুট লম্বা একটা বাঘকে ঘায়েল করিয়াছিলেন, নিজ হাতে ক্ষমতা পাইলে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন সে শিকারে যাইবে এবং অচিরেই বাবার চেয়েও পাকা শিকারী হইয়া উঠিবে—এই কথাগুলিই প্রসঙ্গক্রমে সে মৃন্ময়কে বলিয়া চলিল।

মৃন্ময় কতক শুনিতেছিল কতক বা শুনিতেছিল না। হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি কি বলছিলেন ত'?

ছেলেটি হাসিয়া উত্তর দিল, শিকারের গল্প আপনার ভাল লাগে না বুঝি? এঃ···তার ভাবখানা এইরূপ যেন মৃন্ময় একটা অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু মৃন্ময় তার উক্তির সহজ সারল্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাংলোয় ফিরিতে মৃন্ময়ের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ছেলেটির সাদর আহ্বানকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া লিলির জ্বরের তাপ দেখিয়া সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। নার্সকেও খুব ব্যস্ত দেখা গেল।

লিলির জ্ঞান ছিল না, মাঝে মাঝে এলোমেলো বকিতেছিল···নিজের লাঞ্ছিত জীবনের অসম্বন্ধ ইতিহাস। নার্স ইহাকে প্রলাপ মনে করিলেও, মৃন্ময়ের কিন্তু ঠিক তাহা মনে হইল না।

পরের দায় ঘাড়ে লইয়া মহা বিপদেই সে পড়িয়াছে। এখন চলিয়া যাইতেও বাধে—পড়িয়া থাকিতেও মন চাহে না। লিলির ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখের পানে চোখ পড়িতেই কেমন মায়া হয়। সহায়সম্পদহীন বেচারী। মৃন্ময় অপটু হাতে লিলির পরিচর্য্যা করিতে অগ্রসর হয়। নার্স বাধা দেয়, আমি যখন রয়েছি—

মৃন্ময় কহিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে···

উত্তর মিলিল, তা আছে বৈ কি, কিন্তু আমরা এ কাজে অভ্যস্ত; আপনি তা নন।

কথাটা সত্য। তা ছাড়া মৃন্ময় এই মুহূর্ত্তে বড় ক্লান্ত। উপকার করিতে গিয়া ক্ষতি করিয়া বসিলে তখন ঝুঁকি লইবে কে? মৃন্ময় একটু যেন লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, কথাটা মিথ্যে বলেন নি আপনি, কিন্তু দরকার হলেই ডাকবেন আমায়। আমি পাশের ঘরেই আছি।

মৃন্ময় প্রস্থানোদ্যত হইয়া পুনরায় থামিল, কহিল—ওর মানসিক অবস্থা ভাল নয়, ভাল থাকতেও পারে না। তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমি আবশ্যক বোধ করি। লিলির শরীরের অবস্থা বুঝে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করবেন। অবস্থাটা ডাক্তারকে জানানো হয়েছে তো?'

নার্স কহিল, আপনার উপদেশ ভুলব না। তবে আমরা এই নিয়েই

তো দিনরাত আছি—দেখলেই টের পাই।. ডাক্তারকে আমি সবই বলেছি। ব্যবস্থাও সেই মতই হয়েছে।

মৃন্ময় নার্সকে ধন্যবাদ দিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

খবর পাইয়া রাজাবাবুর পুত্রও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নার্সকে বার বার সাবধান করিয়া দিল এবং মৃন্ময়কে শিকারে লইয়া যাইবার জন্য বারকয়েক দুঃখপ্রকাশ করিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তা বলে ভয় পাবার কিছু নেই। এখানকার জল গায়ে পড়লেই প্রায় সবাইকেই প্রথম প্রথম এমন ভুগতে হয় এক-আধবার। সয়ে গেলে আর দুর্ভাবনা থাকে না।—

তা হয়তো থাকে না, কিন্তু মৃন্ময়ের দিনগুলি যেন অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়া চুপচাপ রুগীর ঘরে দিন কাটানোতে সে অভ্যস্ত নয়। তাই বড় অস্বস্তি বোধ হয়। তা ছাড়া সমস্ত ঘটনাটা তাহাকে যেন কতকটা অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেটি রোজই একবার করিয়া দেখা দিয়া যায়। দূর হইতে দৈনন্দিন খবরাখবর লইয়া যায়। কথাবার্ত্তার ধারা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। মৃন্ময়ের এই নিঃসঙ্গতা ভাল লাগে না।

লিলি এখন আরোগ্যের মুখে। জ্বরটা মারাত্মক না হইলেও ভোগান্তি কম হইল না। সে প্রায় দুই সপ্তাহ এখানে আসিয়াছে। নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া মঞ্জুষা কিংবা তার বাবাকেও একটা সংবাদ দেয় নাই। না জানি তাঁরা কি ভাবিতেছেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে এমনটি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

গত কাল লিলি অন্নপথ্য করিয়াছে। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই সে গ্রামের পথে যাত্রা করিতে পারিবে। আর কোন খবর সে দিবে না—যখন এতদিনই দেয় নাই। অকস্মাৎ সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবে.। মা হয়তো পূর্ব্বে না জানাইবার জন্য ধমকাইবেন—তার বাবা

হয়তো খড়ম পায়ে খট্‌মট্‌ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবেন মার রান্নার তদারক করিতে। কিংবা রাত্রেই ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক কচি বেগুন তুলিয়া আনিয়া ডালের সহিত ভাজার ব্যবস্থা করিবেন।

মৃন্ময় সহসা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। গ্রামের একখানি জীবন্ত চিত্র তার চোখের সম্মুখে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুঁটিরামের বড় দীঘির স্বচ্ছ জল তার চোখের সম্মুখে যেন টলমল করিতেছে। পরন্ত রোদের শেষে ম্লান আভা দীঘির জলে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে—আর সেখানে সাঁতার কাটিতেছে বেলে হাঁসের ঝাঁক। মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে সাদা বকের সারি। মেঠো পথ ধরিয়া কৃষকেরা চলিয়াছে লাঙ্গল কাঁধে নিজ নিজ ঘরের পানে। মৃন্ময় যেন একটা জীবন্ত সত্তার অনুভূতিতে বিহ্বল হইয়া পড়িল। দীঘির পাড়ে জলের কোল ঘেঁষিয়া কত লোক দল বাঁধিয়া মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছে। এইবার হয়তো অনেকেই ছিপ গুটাইয়া গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিতেছে। রোদের ম্লান আভাটুকুও হয়তো আর নাই। নারিকেল গাছের পাতায় পাতায় আলোর নাচন এতক্ষণে থামিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠিয়াছে মঙ্গল-শঙ্খ। এক যায়, আর এক আসে—এ যেন তারই আহ্বান। মৃন্ময়ের ভাল লাগে। শুধু ভালই লাগে না। সে ভালবাসে গ্রামের এই পারিপার্শ্বিককে, তার সুখ আর দুঃখকে—যার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ।

লিলি মৃদু কণ্ঠে আহ্বান করিল। মৃন্ময় এক মুহূর্ত্তে কল্পনা হইতে বাস্তবের কঠিন স্তরে ফিরিয়া আসিল। লিলি কহিল, কাল কিন্তু একটু বেশী দূরে নিয়ে যেতে হবে। এখন তো একরকম সেরেই উঠেছি আমি, দেহে খানিকটা জোরও পাচ্ছি। তা ছাড়া আর কটা দিন আছেন আপনি।

একটু থামিয়া লিলি পুনরায় কহিল, বেশ হ'ল কিন্তু। সহজ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমরা একে অপরের আত্মীয় নই, অথচ সত্যিকারের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠল। গড়ে যখন উঠলই তখন তা একেবারে ভেঙে ফেলবেন না। আমি যে কত বড় অসহায় তা আপনার চেয়ে বেশী তো আর কেউ বুঝবে না।

মৃন্ময় শুধু খানিক হাসিল, কোন উত্তর দিল না। অসুখের পরে লিলি যেন খানিকটা ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে।

লিলি পুনশ্চ কহিল, এবারে কিন্তু মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

কথাটা বলিয়াই লিলি কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই সামলাইয়া লইয়া সে. কহিল, তা বলে তাকে আমার আসল পরিচয় না দিয়ে নিয়ে আসবেন না যেন।

এক মুহূর্ত্তে লিলি বদলাইয়া গেল। তাহাকে যেন আরও ফ্যাকাসে, আরও দুর্ব্বল দেখাইতেছে।

মৃন্ময় সবই দেখিল, সবই বুঝিল। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, তোমার সত্য পরিচয়ই আমি তাকে দেব। তাতে তোমার গৌরব এতটুকু ম্লান হবে না। না জেনে যে ভুল আমি করেছিলাম তার লজ্জা এবং গ্লানি আজও আমি ভুলতে পারি নি। আমার একথা তুমি বিশ্বাস কর লিলি।

লিলি নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ও তখনকার মত আর কোন কথা কহিল না। বলিবার মত কিছু হয়তো ছিলও না।...

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঝি কিছুক্ষণ হইল আলো দিয়া গিয়াছে। মৃন্ময় সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল লিলির দু'চোখের কোল বাহিয়া জল ঝরিতেছে। কিন্তু না দেখার ভান করিয়া সে পুনরায় কহিল, আমার ঠিকানা

তো তোমার কাছে রইল লিলি। যখনই দরকার বুঝবে আমায় ডেকো। আমার দ্বারা তোমার অসম্মান কখনও হবে না।

মৃন্ময় হয়তো বুঝিল না যে, তার এই শেষ কথায় লিলির চোখের জলের ধারা আরও প্রবল বেগে নামিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিয়া উঠিল, মানুষের সঙ্গে কি করে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হয় সে হিসাব কখনও আমি করে দেখি নি, কিন্তু কোন দিন যদি আমার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখ আমায় বিনা দ্বিধায় স্মরণ করিয়ে দিও। আমার মনে হয় আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতার এইটেই হ'ল ভিত্তি।

উভয়ে নীরব। ভাষা যেন দু'জনের অকস্মাৎ মূক হইয়া গিয়াছে।

ইহারই দিনকয়েক পরে শীঘ্রই আবার দেখা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মৃন্ময় গ্রামের পথে যাত্রা করিল।

১৮

আজ ঘাটে ষ্টীমার ভিড়িতে ঘণ্টাকয়েক দেরি হইয়াছে। মধ্যপথে চড়ায় ঠেকিয়া এই বিপত্তি। এমন প্রায়ই হইয়া থাকে। পদ্মার ভাঙাগড়া প্রতিনিয়তই চলিয়াছে। মৃন্ময় আজ চটিয়া গিয়াছে; রাগটা তার অকারণ নহে, কিন্তু তাহা কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের উপরে নহে। এ রাগের ধরণ আলাদা।

নিশুতি রাত, গ্রাম স্তব্ধ, তন্দ্রাছন্ন। মৃন্ময় তার চামড়ার সুটকেশটি হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কতটুকু আর পথ। এটা নিজেই

বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। ইহার জন্য আবার মুটের প্রয়োজন কি ; আর একটা বাঁকের পরেই মঞ্জুষাদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তারপর আর একটা মোড় শেষ হইলেই তাহাদের বাড়ী।

মঞ্জুষাদের বাড়ীর কাছে আসিতেই মৃন্ময়ের বুকের ভিতরটা একটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! এতবড় বাড়ীর কোথাও একটা আলো নাই। প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেন নিরেট একস্তূপ অন্ধকারের মত নিশ্চল। শুধু দেউড়ীর ফটকে দরোয়ান নিশ্চেন্তে ঘুমাইতেছে। এমন ত কোন দিন ছিল না। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে আগাইয়া চলিল। ভাবিতে লাগিল, মঞ্জুষার মায়ের অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নাই ত? মনের মধ্যে কেমন একটা আশঙ্কা লইয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু বিস্ময় তার সীমা অতিক্রম করিল যখন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বিস্তর চেঁচামেচি করিবার পর কেবলমাত্র তাহার মা ঘুম হইতে উঠিয়া আসিলেন। পিতার দেখাই পাওয়া গেল না। মৃন্ময় উৎকণ্ঠিতভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিল। সেখানে আনন্দের অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে কেমন একটা ক্লিষ্ট বেদনার ছাপ দেখা গেল। মৃন্ময়ের কোন প্রশ্ন করিতেও ভরসা হইতেছিল না। অবশেষে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইল ক'দিন ধরেই তাঁর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। তাই আর উঠলেন না। কিন্তু এটা কেমন উত্তর। আজ কতদিন পরে সে ঘরে ফিরিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য কোথাও যেন এতটুকু আগ্রহ নাই, আনন্দের প্রকাশ নাই—কেমন একটা নিরানন্দ পরিবেশ যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিছু একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিয়াছে—ইহা কেহ না বলিলেও সে অনুমান করিয়া লইল, কিন্তু পাছে বাস্তবের আকস্মিক আঘাত মর্ম্মান্তিক হয় তাই আর এই মুহূর্ত্তে সে কোনও প্রশ্ন করিল না— শুধু অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে মাকে কহিল, বড় খিদে পেয়েছে। পথে আজ এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত খাই নি।

মা কলের পুতুলের মত অগ্রসর হইলেন...

পরদিন একটু অধিক বেলায় মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙিল। রাত্রে সে ঘুমাইতে পারে নাই। কেমন একটা অজানা দুশ্চিন্তা সারা রাত তার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। শেষ রাত্রের দিকে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল মাত্র। শয্যাত্যাগ করিয়া মাকে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তিনি গ্রামান্তরে গিয়াছেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। মৃন্ময়ের ধৈর্য্যের শেষ সীমা যেন অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। সে প্রশ্নের পর প্রশ্নে মাকে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু কয়েক ফোঁটা চোখের জল ছাড়া অন্য কোন উত্তর পাইল না। মায়ের এই নীরবতার অন্তরালে যে কোন নিদারুণ ব্যাপার রহিয়াছে ইহা মৃন্ময়ের চোখে দিবালোকের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া এই বিসদৃশ আচরণের কোনই অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিল না। মৃন্ময় চটিয়া গিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও কি বাঁচোয়া আছে। যাহার সহিত দেখা হয় সে-ই কেমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া থাকে—কোন কথা বলে না, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেয় না।

মৃন্ময় দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল। একবার মঞ্জুষার সহিত দেখা করা তার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সেখান হইতেও তাহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। দরোয়ান পথরোধ করিয়া জানাইল যে, বাবুলোক কেহ নাই।

মৃন্ময় অসহিষ্ণু ভাবে প্রশ্ন করিল, কোই মায়ীলোক।

দরোয়ান মৃন্ময়ের মুখের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় জানাইয়া দিল—কেউ নাই। বলিয়াই তাহাকে সেলাম করিল—ইহার অর্থ অতি পরিষ্কার। মৃন্ময় পুনরায় রাস্তা ধরিল। খানিক পরে রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের বুকে আসিয়া পড়িল, ভাবিল, একবার রাধু বোষ্টমের

কাছে গিয়া দেখিবে। আজ একই সঙ্গে তার মা, বাবা, গাঁয়ের লোক সবাই যেন তার কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময় মেঠো পথ ধরিয়া অন্যমনস্ক ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল। এক পাশে লঙ্কা, অপর পাশে বেগুনের ক্ষেত—মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে আঁকাবাঁকা রাস্তা।

এই তার গ্রাম—যার কথা প্রবাসে তার স্মৃতিতে বড় মধুর হইয়া জাগিয়া উঠিত। গ্রাম তার একান্ত আপনার—কত বড় গর্ব্বের জিনিষ তার জন্মপল্লী। গাঁয়ের মানুষই শুধু যে তার পরমাত্মীয় তা নয়, এখানকার মাটি জল বায়ু সবকিছুরই সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ; কিন্তু আজ সবই যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু ইহার যথার্থ কারণ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাই সে অন্ধের মত খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

রাধু বোষ্টম তার মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একতারা সংযোগে একটি প্রভাতী বাউল গাহিতেছিল। মৃন্ময়কে সেইদিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে একতারাটি বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়া রাখিয়া তাহার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মৃন্ময় দ্রুত আসিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল এবং কোন ভূমিকা না করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, এ সব কি বোষ্টম-দা। গাঁয়ের সবাই আমার ওপর হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠল কেন?

রাধু টানিয়া টানিয়া কেমন এক ধরণে হাসিতে লাগিল। রাধুর এমন হাসির সহিত ইতিপূর্ব্বে মৃন্ময়ের পরিচয় হয় নাই। শত দুঃখেও তার প্রাণখোলা হাসির এতটুকু ব্যত্যয় কখনও ঘটে নাই।

মৃন্ময় অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, ভূত তোমার ঘাড়েও চেপেছে দেখছি।

রাধু হঠাৎ নিরতিশয় গম্ভীর হইয়া উঠিল। শান্তকণ্ঠে কহিল, ভূত কার ঘাড়ে চেপেছে সে মীমাংসা পরে করো। এসেছ যখন বসো। ব্যস্ত

হয়ো না।—বলিয়াই অন্দরের দিকে মুখ ফিরাইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিল, ঘরে অতিথি-নারায়ণ এসেছেন সৎকারের ব্যবস্থা কিছু হবে নাকি গো। পরে মৃন্ময়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, নবদ্বীপ থেকে বোষ্টমীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি দাদাঠাকুর। বোষ্টমী তার ভুল স্বীকার করেছে। ভেবে দেখলাম ভুলচুক মানুষই করে থাকে—তা ছাড়া বুড়ো হয়েছি। এ বয়সে একজন দেখবার শুনবার লোকও চাই তো।

মৃন্ময় ক্রমশঃই অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। কহিল, ব্যবস্থা তুমি পরে করো। যা জানতে এসেছি, তাই আগে বলো।

রাধু শান্তকণ্ঠে কহিল, তোমরা এত লেখাপড়া শিখেছ দাদাঠাকুর, তবু কত বড় ভুলটা করলে বলো দেখি। এ যে কেউ কোন দিন ভাবতেও পারে নি ভাই। মঞ্জুদিদির মা শেষ দিনটিতেও তোমার নাম করে গেছেন।

মৃন্ময় চীৎকার করিয়া উঠিল, তিনি কি···

বাধা দিয়া মৃদু কণ্ঠে রাধু কহিল, হ্যাঁ তিনি মারা গেছেন। এত বড় আঘাত তিনি কেমন করে সইবেন বলো দেখি। নিজের ছেলে ত বহুদিনই পর হয়ে গেছে। তার পর যাকে নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন—যার দিকে চেয়ে এত দিন আশায় বুক বেঁধে ছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তার কাছ থেকেও পেতে হ'ল তাঁকে দারুণ আঘাত। কক্স-বাজার থেকে ফিরে এসে একটি সপ্তাহও কাটল না।

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে রাধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রাধু বলিয়া চলিল, আর তোমার বন্ধু সুনির্ম্মলবাবুরই বা কি আক্কেল। কথাটা এমন করে রাষ্ট্র না করলেও পারতো। তুমি তো বাবু বন্ধুলোক। এইটেই কি বন্ধুর কাজ হয়েছে? গ্রামময় ঢোল পিটিয়ে দিলে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে শুনিতেছিল, একটা প্রতিবাদ করিতে পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গেল—ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে রাধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রাধুর কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়া আসিল। কহিল, আচ্ছা দাদা-ঠাকুর, এক কথায় এত বড় সম্পত্তি আর মঞ্জুদিদির মত মেয়েকে কিসের মোহে তুমি ত্যাগ করলে? মঞ্জুদিদি তো তোমার অযোগ্য ছিল না। অমন মেয়ে ক'টি মেলে ভাই। আবেগে রাধুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল—

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, যাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছ, একসঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হলে, তাকে তুমি চিনলে না? শেষ পর্য্যন্ত এতবড় আঘাতটা তুমি তাকে দিলে।

মৃন্ময় বোকার মত অর্থহীন দৃষ্টিতে রাধুর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন তার কথাগুলির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ওর চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

রাধু বলিতে লাগিল, মঞ্জুদিদির মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ওদের বাড়ীতে গেলাম। দিদি আমার ঈষৎ ম্লান হেসে বললে, বোষ্টম-দা, মা চলে গেলেন। তাঁর সে মুখ, সে হাসি আমি জীবনে ভুলব না। সান্ত্বনা দেবার ছলে বললাম, সবাইকেই একদিন যেতে হবে দিদি। মঞ্জু দিদি তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি বোষ্টম-দা। এক এক করে অনেকেই তো গেল।

মৃন্ময় নীরব।

রাধু বলিয়া চলিল, মিথ্যে তো সে বলে নি—জবাব দেব কি! ভাই তাদের অনেক আগেই ত্যাগ করেছে। এখন মা চলে গেলেন চিরতরে। কিন্তু তুমি কেন এমন কাজ করলে দাদাঠাকুর! তোমার যারা একান্ত আপনার জন তাদের কত বড় মনস্তাপের কারণ হলে বলো দেখি। একজন দুঃখের আঘাতে প্রাণ হারালেন। অমন যে শিবতুল্য মানুষ, বুড়ো বয়সে তিনি মেয়ের হাত ধরে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

গ্রামে তিনি আর ফিরবেন না। ভাবতে পার দাদাঠাকুর তোমার সামান্য একটা বদ খেয়ালের জন্য কত বড় শোচনীয় ব্যাপার ঘটলো। তোমার বুড়ো বাপ-মা লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারেন না। একটা খ্রীষ্টান মেয়ের প্রতি আসক্তি তোমার এত বড় হয়ে উঠল যে, তার কাছে সমাজ, সংসার, বাপ, মা সবকিছু ভেসে গেল। তবুও দিদি আমার একটি বারও কারু কাছে নালিশ জানায় নি।

মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখ হইতে একটা কালো পর্দ্দা যেন ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। লিলি ঠিকই বলিয়াছে, সুনির্ম্মল বিলাত যায় নাই। শুধু তার চরম সর্ব্বনাশসাধন করিবার জন্যই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কেন! কেন সে তার এত বড় সর্ব্বনাশ করিল। মৃন্ময় ত তার ক্ষতি করা দূরে থাকুক, ভুলেও কোনদিন অনিষ্টচিন্তা করে নাই। আর রুবি? সেও কি আগাগোড়া তার সঙ্গে নিপুণ অভিনয় করিয়া গিয়াছে? মৃন্ময় পাগলের মত বারকয়েক মাথা নাড়িল—ঠিকই হইয়াছে—লিলির কোন দাবিই যাহাতে ভবিষ্যতে না উত্থাপিত হইতে পারে ইহা তারই সু-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। মূর্খ সে তাই আগাগোড়াই ভুল বুঝিয়াছে। কিন্তু ভুল সে করে নাই। একটি মেয়েকে তার চরম দুর্দ্দিনে সামান্য একটু সাহায্য করিয়াছে মাত্র। আর যাঁরা তাকে ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, যাঁদের সন্তান বলিয়া নিজেকে সে গৌরবান্বিত মনে করে—তাঁরা তাকে সামান্য বিশ্বাসটুকুও করিতে পারিলেন না। তাকে এতবড় নিষ্ঠুর অপদার্থ বলিয়া মনে করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। মৃন্ময় সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, আর তোমরা সকলেই যাকে কোন দিন চোখেই দেখ নি তার কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করলে, আশ্চর্য্য!

মৃন্ময়ের তীব্র কণ্ঠস্বরে রাঁধু কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ়ের মত তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তাই কি সহজে কেউ বিশ্বাস

করেছে দাদা। এ নিয়ে কলকাতায় ছুটাছুটি পর্যন্ত কম হয় নি। তা ছাড়া অত সাক্ষী প্রমাণ। সবচেয়ে বড় প্রমাণ তোমার অমন চোরের মত পালিয়ে যাওয়া। রাধু ক্ষণকাল থামিয়া একটু যেন উত্তেজিত কণ্ঠেই পুনরায় কহিল, তুমি কি করেছ না করেছ সে প্রসঙ্গ না হয় আর তুলব না—কিন্তু পরীক্ষা-শেষে তোমার কলকাতা ছেড়ে দূরদেশে যাবার এতই যদি প্রয়োজন হয়েছিল একটা চিঠি লিখেও ত সে কথা তুমি জানাতে পারতে দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় ভগ্ন কণ্ঠে যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল, ভগবান বিরূপ, নইলে এমন হবে কেন? একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধু কহিল, এখুনি যাবে?

মৃন্ময় বড় করুণ একটু হাসিয়া কহিল, হাঁ বোষ্টম-দা আমি এখন যাই। কিন্তু যাবার আগে শুধু একটা কথাই বলে যাই—তোমরা যা শুনেছ সব মিথ্যা। দুঃখ আমার যে তোমরা সবাই আমায় ভুল বুঝলে। একটা মুখের কথাও কেউ জিজ্ঞেস করলে না। করলে আমি মিথ্যা বলতাম না। শোন রাধুদা—না থাক্, তোমরা সবাই সমান।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল।

১৯

রাধু বিস্মিত চোখে চাহিয়া রহিল। কোথাও যে একটা মারাত্মক ভুল হইয়া গিয়াছে একথা সে বিশ্বাস করিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটা

কথাও বলিতে পারিল না। তার চোখে মুখে একটা অসহায় উদ্বেগ-ব্যাকুল ভাব ফুটিয়া উঠিল।

মৃন্ময় ততক্ষণে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া আজই সে চলিয়া যাইবে। আজই—এই মুহূর্ত্তেই। একটি মুহূর্ত্তের বিলম্ব তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমাধি রচনা হইয়াছে। এখানে আর কিসের মোহে সে পড়িয়া থাকিবে?

গ্রামকে সে ভালবাসে। এই মাটির উপর তাহার গভীর টান। কিন্তু কোন আকর্ষণই আর তাহার গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। গ্রামের প্রকৃতিও যেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার পানে চাহিয়া অবিশ্বাসের তিক্ত হাসি হাসিতেছে। আকাশে যেন কিসের একটা কুটিল ইঙ্গিত। চতুর্দ্দিকে শুধু ছি ছি রব উঠিয়াছে। কিন্তু কেন? সে ত কোন অন্যায় কাজ করে নাই—কোন দিন অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দেয় নাই।

মৃন্ময়ের গতি দ্রুততর হইয়া উঠিল। তাহার অতীত জীবন সব মুছিয়া যাক, বিলুপ্ত হইয়া যাক। কিন্তু নদীতীরের বুড়ো বটগাছের তলায় আসিয়া সহসা তাহাকে থামিতে হইল। তাহার চলার গতি কে যেন অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে থামাইয়া দিয়াছে। অতীতের কত কথাই না মনের কোণে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। এই গাছতলায় বসিয়া কত দিন সে আর মঞ্জুবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। সেই গাছ—সেই নদী—সবুজ ঘাসের মসৃণ আস্তরণ—সব কিছুই বিগত দিনের মধুর স্মৃতি বহন করিয়া আজিও বিরাজ করিতেছে। আজিও নদীর জলে তেমনি ঢেউয়ের নৃত্য···তাহাদের দু'জনের বুকেও যাহার দোলা লাগিত।

একই সুর, একই তাল নিত্য তাহাদের কাছে নূতন রহস্যের সন্ধান বহিয়া আনিত। কিন্তু আজ নদী তাহার কাছে সুরহারা, ছন্দহীন। নাই তার কোন রূপ, কোন রস, কোন আকর্ষণ। শুধু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, শুধু একটা স্মৃতির আলোড়ন তাহার বুকের পাঁজরগুলিকে পর্য্যন্ত যেন শিথিল করিয়া দিয়াছে।

মঞ্জুষাকে লইয়া নীড় রচনা করিবার কত মধুর কল্পনা যে অনুক্ষণ তাহার মনে জাগিত সে খবর কেউ রাখে না—এমন কি, মঞ্জুষা নিজেও নয়। কেমন করিয়া দাম্পত্য জীবনের সূচনা করবে তাহারই নিপুণ আলেখ্য মনের পাতায় পাতায় অঙ্কিত করিয়া সে স্বকীয় চেতনা দ্বারা তাহা অনুভব করিয়া দেখিত। হয়তো মঞ্জুষা তাহার মায়ের সহিত গল্প করিতে থাকিবে, কিংবা গৃহস্থালির সহায়তায় রত থাকিবে। মৃন্ময় মায়ের অলক্ষ্যে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া আত্মগোপন করিবে, কিম্বা পাঠরত মঞ্জুষার চোখ টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবে। তাহার পরে নিজেই প্রশ্ন করিবে, বলতো কে? মঞ্জুষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিবে, রাজা বাদশা কেউ বোধ করি। কিন্তু দয়া করে চোখ ছাড়ুন। মৃন্ময় হয়তো তখন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া অতি সন্তর্পণে একটি···

মঞ্জুষা এক হাতে তার চিবুক ঠেলিয়া ধরিয়া ত্রস্ত কণ্ঠে কহিবে, এই ছাড়..আ···জ্যাঠাইমা! মৃন্ময় সে কথায় কান দিবে না—মুচকি হাসিয়া কহিবে, এই কি···বল মিনুদা...নইলে ..এক, দুই, তিন...শেষ পর্য্যন্ত মঞ্জুষা তার দুই বাহুর বন্ধনে পরিপূর্ণ ভাবে ধরা দিবে।

জ্যোৎস্না রাত্রে সে তাহার মনের পুঞ্জিত কথার ভাণ্ডার উজার করিয়া ফেলিবে। এত কথা যে সে জানে সেকথা তাহার নিজেরও অগোচর

ছিল। কিসের পরশে যেন আজ তাহা দুকূল ছাপাইয়া উপচাইয়া উঠিয়াছে। গল্পের মাঝখানে হয়তো পাখীরা কলরব করিয়া জানাইবে প্রভাতের নির্দেশ। মঞ্জুষা হাসিয়া কহিবে, এত কথাও তুমি জান। তখন ত একদম বোবা হয়ে থাকতে। মঞ্জুষার কথায় মৃন্ময় রাগ করিবে না বরং হাসিমুখে তাহাকে আরও কাছে টেনিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিবে, এই মুহূর্ত্তে ওসব পুরনো কথা টেনে এনে নিজেকে ফাঁকি দিতে আমি পারব না। মঞ্জুষা তখন হয়তো ঘাড় বাঁকাইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিবে, বুঝেছি থাক, মশাই।

তাই ত মৃন্ময় আজ আবার নূতন করিয়া ভাবিতেছে। কোথায় রহিল সেদিনের কল্পনা। তাহার আশার স্বপ্ন-সৌধ-রচনা। তাহার জীবনে মঞ্জুষার যে এমন করিয়া মৃত্যু ঘটিবে তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছে। অথচ একদিন তাহাদের মৃদু-গুঞ্জনে এখানকার আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। নদীজলের কলতানে তাহাদের বুকের কথা ছন্দে সুরে বহিয়া যাইত।

মৃন্ময় হঠাৎ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। এ সব সে কি ভাবিতেছে। তাহার জীবনে এ চিন্তাও আজ নিছক বিলাসিতা। মৃন্ময় পুনরায় চলিতে সুরু করিল। সম্মুখে তাহার সীমাহীন পথ।…গৃহে ফিরিয়া আর কাজ নাই। এখান হইতেই সোজা সে ষ্টীমার-ঘাটে যাইবে। ষ্টীমার যদি পাওয়া যায় ত ভালই, নহিলে নৌকাযোগেই সুরু হইবে তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রা। এখানে আর একটি দিনও সে থাকিতে পারিবে না। এখানে সবকিছুই তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে। তাহার উপর আর কাহারো আস্থা নাই। মৃন্ময়ের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাপ্ মা তাহাকে অবিশ্বাস করেন্। মঞ্জুষাও তাহাকে বিশ্বাস করে না। অথচ সে একদিন মৃন্ময়কে ভালবাসিত—যে ভালবাসায় খাদ ছিল না।

একথা মৃন্ময়ের চেয়ে বেশী করিয়া আর কে জানে? কিন্তু মঞ্জুষা যে তাহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে একথা ত কেহ তাহাকে বলে নাই। জবাবটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে পাইল, যে কথা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে সে কথা মঞ্জুষা অবিশ্বাস করিবে কোন যুক্তিতে। আর সত্য বলিয়াই যদি সে না মনে করিবে তবে নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল কেন? অন্ততঃ তাহার মুখের স্বীকারোক্তির অপেক্ষায় না হয় আর দিনকয়েক অপেক্ষা করিত।

একথা মৃন্ময়ের মনে একবারও জাগিল না যে, মন যখন ভাঙিয়া যায়, তখন যুক্তিতর্ক অথবা কাণ্ডজ্ঞান মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই পঙ্গু হইয়া যায়।

ষ্টীমার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া গেল। নূতন করিয়া মৃন্ময়ের যাত্রা সুরু হইল। যদিও সে জানে না কোথায় কত দূরে গিয়া তার এ নিরুদ্দেশ-যাত্রা শেষ হইবে।

গ্রামের উপর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপর, এমন কি তার নিজের উপর পর্য্যন্ত তার প্রবল অভিমান দেখা দিয়াছে। সহসা মৃন্ময়ের দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে সতৃষ্ণ নয়নে গ্রামের পানে চাহিয়া রহিল, গ্রাম্যপ্রকৃতির অনেক কিছুর সহিত আজও মঞ্জুষা মৃন্ময়ের কাছে জীবন্ত। এখানকার বেতঝোপ, বনকাঁটালির ঝাড়, ফণীমনসা গাছের সারি, নাঙ্কুদের কলাবাগান, চাটুজ্যেদের আমবাগান, বড় চালতা গাছটা, ফেলিদিদির ধনে শাকের ক্ষেত ইহারা তাহাদের অতীতের বহু ঘটনার মূক সাক্ষী। কোথায় একটা পাখী অবিশ্রান্ত "বউ কথা কও" রবে ডাকিয়া মরিতেছে। অনন্তকাল ধরিয়াই বুঝি এমনি করিয়া ডাকিয়া চলিবে।

কত তুচ্ছ ঘটনা—যাহা শৈশবে তাহাদের দিনগুলিকে মনোরম করিয়া তুলিত, কৈশোরে তাহাই ভাবিতে গিয়া কেমন একটু কুণ্ঠিত

লজ্জা অনুভব করিত, যৌবনে আলোচনার বস্তু হইয়া তাদের কত কথার রসদ যোগাইত। আজ সেদিনের সে কাহিনী অনুক্ষণ তাহার মনকে পীড়া দিবে। অথচ এক দিন এই স্মৃতিকে সে সংগোপনে নিজের অন্তরের মণিকোঠায় বহন করিত।

রাত নয়টায় মৃন্ময় আসিয়া কলিকাতা পৌছিল। পেটে ক্ষুধা আছে, কিন্তু আহারে প্রবৃত্তি নাই। সে রাতটা সে ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটাইয়া দিল। পরদিন ভাবিল, একবার সুনির্ম্মলের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসে যে, কেন সে মৃন্ময়ের এত বড় ক্ষতি করিল। মনের মধ্যে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিলেও সে আত্মসম্বরণ করিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় দ্বারা করিতে তার বিচারবুদ্ধি সায় দিল না। সুনির্ম্মলের যদি মনুষ্যত্ব থাকিত ত তাহার সহিত দেখা করায় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে শুধুমাত্র পশুবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছে, নারীমাত্রেই যাহার কাছে ভোগ-বিলাসের পণ্য-সামগ্রী তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতেও তাহার অন্তরাত্মা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তবুও কিন্তু ভিতর হইতে তাগিদ আসে। একবার রুবির সহিত দেখা করিতে মন উন্মুখ হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তুমি ত সবই জানিতে তবু কেন এই চক্রান্ত, এই দুরভিসন্ধি···এমনি অভিনয়, আর এত বড় ছলনাকরিলে ?

মৃন্ময়ের চিন্তাধারা যেন একটা সহজ পথ ধরিয়া চলিতে পারিতেছে না। সে শুধুই ভাবে, এবং এক সময় তাহাকে সুনির্ম্মলের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়। আজ আর সহজ ভাবে এ বাড়ীতে সে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেমন একটা অনাবশ্যক কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ তাহাকে বাধা দিতেছিল। অথচ তাহার কুণ্ঠিত অথবা সঙ্কুচিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু অপমানের চূড়ান্ত হইল যখন রুবি তাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া বিদ্রূপ করিল। সত্যই এতটা সে আশা করে নাই। হ্যাঁ—বিদ্রূপ ইহারা করিতে পারে বটে! কথাটা এই মুহূর্তে মৃন্ময় নূতন করিয়া অনুভব করিল। উহাদের সাহস আছে—বিদ্রূপ করিবার মত মনোবৃত্তিও আছে। কিন্তু এখনও তুমি অন্তঃপুরিকা কেন? খাসা অভিনয় করিতে শিখিয়াছ। মৃন্ময় মনে যাহাই ভাবুক না কেন মুখে সে একটি কথাও বলিতে পারিতেছিল না। দু' চোখে তার বিস্মিত দৃষ্টি।

তার সে দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু রুবির কণ্ঠস্বর সহসা নরম হইয়া আসিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, দেখুন মৃন্ময়বাবু মিথ্যে আপনি আর আমায় জ্বালাতন করতে আসবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ, আমার দ্বারা আর কোন অপ্রীতিকর কাজ করাতে আপনি আমাকে বাধ্য করাবেন না। এটুকু দয়া আপনি করবেন—

মৃন্ময় সহসা পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল সুতীব্র ব্যঙ্গের সুর—দয়া···দয়া করবার জন্যই ত এসেছি। কিন্তু আমি ভাবছি আপনারাও মানুষ। মানুষেরই মত আপনারা হেসে কথা বলেন, দুপায়ে হেঁটে চলেন।

রুবির স্বর পুনরায় কঠিন হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে ডাকিল, মৃন্ময়বাবু—

মৃন্ময় তেমনি বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করেন কেন? দুটো সত্য কথাই না হয় বলেছি।—একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, না হয় আর বলব না। কিন্তু রুবিদেবীর আর কোন অনুরোধ নেই আমার কাছে, আর কোন রকমের সাহায্য? আর একবার দাদার বিরুদ্ধে মামলা করবার অনুরোধ করবেন না? কিংবা অন্য কিছু···

রুবি পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল, এর পরেও যদি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকেন তবে বাধ্য হয়ে আমাকে···

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া পুনরায় মৃন্ময় কহিল, দারোয়ান ডাকবেন এই ত? আপনাদের অনেক টাকা আছে—দেউড়ীতে দারোয়ান আছে সে কথা জেনে শুনেই এ বাড়ীতে পা দিয়েছি। নিজেদের অনেক ছোট করেছেন—এটুকু আর বাকী রাখেন কেন। আপনাদের আসল পরিচয় জানতে ত আমার বাকী নেই—

মৃন্ময়ের মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রুবি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আজ তাহার এই সর্ব্বপ্রথম মনে হইল যে, কাজটা সে ভাল করে নাই।

পুনরায় মৃন্ময় চলিতে সুরু করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহার নাই। কিন্তু জীবনধারণ করিতে গেলে মানুষকে অনেক কিছুই করিতে হয়, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইতে হইলে অর্থেরও একান্ত আবশ্যক। নিজেকে সে স্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে না। তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং মানুষের মতই বাঁচিতে হইবে।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে একটি পার্কে আসিয়া বসিল। সেখানে নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। মৃন্ময় সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল যে, মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস। সে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অকস্মাৎ মঞ্জুষা যেন চোখের সম্মুখে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়ায় তাহাকে যেন আর চেনাই যায় না। অনেকখানি শীর্ণ হইয়াছে। মুখে আর সে লাবণ্য নাই। শুধু দুই চোখে তার নালিশের ইঙ্গিত।

মৃন্ময় অর্থহীন চোখে চাহিয়া দেখিতেছে—যেখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে, যেখানে ওরা খেলার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে যেন তাহার শৈশবের সঙ্গিনী মঞ্জুষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন সে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিতেছে, জান মিনুদা, আমাদের বাগানে কত পেয়েরা পেকেছে চলো দু' জনে পেড়ে খাই গে। পরে অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে পুনশ্চ যেন বলিয়া উঠিল' বাঁড়ুজ্যেদের চালতা গাছে অনেক চালতাও আছে—টক টক আর মিষ্টি মিষ্টি, ধনে শাক আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেশ হয় কিন্তু। বা রে—চলো না। —মৃন্ময় গিয়াছিল বৈকি। তার পরে আর একদিন—মৃন্ময় খুব মনোযোগের সহিত বাঁশের কঞ্চি আর নারিকেল গাছের পাতার সাহায্যে ঠাকুরঘর নির্ম্মাণে ব্যস্ত—মঞ্জুষা আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল। অন্যমনস্কভাবে কঞ্চি কাটিতে গিয়া মৃন্ময় একটা আঙ্গুলের আধখানা কাটিয়া ফেলিল। তার আজও পরিষ্কার মনে পড়ে এক হাতে নিজের কাটা আঙ্গুল চাপিয়া ধরিয়া মঞ্জুষাকেই তাহার সান্ত্বনা দিতে হইয়াছিল। বোকা মেয়ে কাঁদিয়া আকুল। সেদিনকার কাটা ঘা আজ শুকাইয়াছে, দাগও মিলাইয়া গিয়াছে কিন্তু নাড়া পাইয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে। অতীতের অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিলুপ্ত হয় না, মনের গহনে ঘুমাইয়া থাকে মাত্র। ইহার প্রভাব মানুষের জীবনে নিতান্ত কম নয়। তাহাদের চেতনার সহিত ইহার অস্তিত্ব। প্রয়োজনে ঘটে আবির্ভাব।

কিন্তু মঞ্জুষা কেমন করিয়া সেদিনকার কথা ভুলিয়া গেল! কেমন করিয়া সে মৃন্ময়কে এমন অসঙ্কোচে অবিশ্বাস করিতে পারিল। নহিলে দিনকয়েক সে অপেক্ষা করিত একবার তার মুখের স্বীকারোক্তির জন্য। সে ত মৃন্ময়কে ভাল করিয়াই জানিত। বস্তুতঃ একথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও মৃন্ময় ভাবিল না, যে নিখুঁত অভিনয়ের জালে পড়িয়া সে নিজেও পথ খুঁজিয়া পায় নাই—প্রায় প্রতি দিনের নিয়মিত সাহচর্য্য তাহাকে যে সত্য

জানিতে দেয় নাই তাহাদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কাছে মঞ্জুষা যদি হারিয়া গিয়াই থাকে তবে তাহার উপর দোষারোপ করা যায় কোন্ যুক্তিতে। মৃন্ময় না জানিলেও আমরা জানি মঞ্জুষা কেমন করিয়া নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল—যাহার জন্য গ্রামে রুবির আবির্ভাব—মৃন্ময় এবং মঞ্জুষার পিতার কলিকাতা গমন। কিন্তু মৃন্ময়ের সামান্য ভুলের জন্য সুনির্ম্মলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল না।

মঞ্জুষা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, এ হতেই পারে না বাবা। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি আছে। মিনুদাকে আমি জানি, এত ছোট কাজ সে করতে পারে না।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, তোমার কথাই সত্য হোক মা। কিন্তু মানুষই দেবতা হতে পারে, আবার তারাই পশুর পর্য্যায়ে নেমে যায়। তবে এমনি একটা খবর যখন পেয়েছি তখন একেবারে চুপ ক'রে থাকি কেমন করে। আমারও যে একটা কর্ত্তব্য আছে মা?

কর্ত্তব্য তিনি পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্রব্যূহে প্রবেশ-পথ পাইলেও বাহিরের পথ খুঁজিয়া পান নাই। জীবানন্দ এবং প্রতুলকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল। মৃন্ময়ের আকস্মিক অন্তর্ধান এবং সর্ব্বোপরি তাহার নীরবতা সুনির্ম্মলকেই সহায়তা করিল। তাঁহাদের বিশ্বাসের শেষ অবলম্বন-টুকুও আর অবশিষ্ট রহিল না।

পিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়াই মঞ্জুষা কতকটা অনুমান করিয়া লইল। তাই আর অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া পিতাকে লজ্জা দিতে এবং সেই সঙ্গে নিজেও ব্যথা পাইতে সে চাহিল না, এবং সকল সময়ই সে মানুষের সংস্রব এড়াইয়া চলিতে লাগিল। মৃন্ময়ের অপরাধের বোঝা যেন শত গুণ হইয়া মঞ্জুষার উঁচু মাথা মাটির সহিত মিশাইয়া দিল।

ইহার পরেই মঞ্জুষার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। জীবানন্দ নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। মঞ্জুষার মনের কোণে যেটুকুও বা অনুকম্পা এবং বিশ্বাসের

ছায়া অবশিষ্ট ছিল তাহাও এই বিপর্য্যয়ে ছত্রাকার হইয়া গেল। মঞ্জুষার মুখের প্রতিটি রেখা কর্কশ এবং কঠিন হইয়া উঠিল। সেখানে দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই। জীবানন্দ ভয় পাইয়া গেলেন। মঞ্জুষাকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, সবই আমার অদৃষ্টলিপি মা। নইলে এমন ত কোনদিন আমি ভাবি নি।

মঞ্জুষা শান্ত কণ্ঠে পিতাকে বলিয়াছিল, তুমি এতে কষ্ট পাচ্ছ কেন বাবা। আমি তোমারই মেয়ে একথা ভুলে যেয়ো না। কারুর কোন কাজেই আমাদের এতটুকুও ক্ষতি হবে না।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, কথাটা ঠিক অমনি করে ভাবতে পারলে ত কোন কথাই ছিল না মা, আমি সবই বুঝি। বোঝাতে আমায় তোরা পারবি নে, কিন্তু আমি যে বড় অসহায়, বড় নিরুপায়।

জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিয়াছিলেন, কারুর বিরুদ্ধে আমার একবিন্দু নালিশ নেই। মৃন্ময় যত বড় অন্যায় করুক না কেন সে সুখী হোক, কিন্তু এখানে আর আমি টিকতে পারছি নে মঞ্জু। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না মা?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোন দূর দেশে চলে যাব মা।

মঞ্জুষা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে এমনি আগ্রহের সহিত পিতার কথা সমর্থন করিয়া কহিল, সেই ভাল বাবা। এমন কোথাও চলো যেখানে কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দেখা পাওয়া যাবে না।

জীবানন্দের কাছে মঞ্জুষার এতখানি আগ্রহ কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। তিনি কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন, কিন্তু এর পরে মিনু যদি আবার ফিরে আসে মা।

মঞ্জুষার দুই চোখ সহসা জ্বলিয়া উঠিল। শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে সে কহিল, তা হলে সে এসে এই কথাই জানবে যে, কারুর জন্যই কারুর

আটকে থাকে না। কিন্তু এ সব কথা আর তুমি ভাবতে পারবে না বাবা! আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বেশ করে ভেবে দেখেছি।

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিয়াছিল, আমি যে মিথ্যে বলছি নে তার প্রমাণ একদিন তুমি পাবে বাবা। মঞ্জুষা মনে মনে এক কঠিন শপথ করিল।

ইহারই পরে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এত কথা মৃন্ময়ের জানিবার নয়, জানেও না। যতটুকু খবর সে রাধু বোষ্টমের নিকট ভাসা ভাসা ভাবে পাইয়াছে তাহাতেই তার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটাই তার চোখে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু মঞ্জুষার মত সে কঠিন হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। বরং তাহার চিন্তা, তাহাদের অতীতের বহু ঘটনা তাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কখন চলিয়া গিয়াছে মৃন্ময়ের হুঁস নাই। বৈদ্যুতিক আলোয় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়িল, তাহাদের গ্রামেও সন্ধ্যা হয়। অন্ধকার নামে, আবার চাঁদের আলো হাসিয়া উঠে। পারিপার্শ্বিকের প্রকৃত রূপ কোথাও ব্যাহত হয় না। আজ তাহার চিরদিনের সেই একান্ত আপন গ্রামকে সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এত ছি ছি আর অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া সেখানে মৃন্ময় আর ফিরিয়া যাইবে না।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মৃন্ময়ের বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এই কয়টা দিন তাহার কেমন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শুধু চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজেকেই সহস্র রকমের প্রশ্ন করা। হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, সে নিজের উপরই অবিচার করিতেছে। জীবনে পরিবর্ত্তন সকলেরই

আসে। তাই বলিয়া এই ভাব প্রবণতা তাহার কেন। তাহাকে বাঁচিতে হইবে, সুদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

মৃন্ময় পুনরায় চলিতে সুরু করিল। রাস্তার শেষে একটা হোটেল হইতে কিছু খাইয়া লইয়া সে পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু এই ভাবে উদ্দেশ্যহীনের মত পথে পথে আর কতদিন সে কাটাইবে?

লিলির কথা তাহার মনে পড়িল। সেই সঙ্গে মনে পড়িল রাজাবাবুর ছেলের কথা। সে-ই ভাল—মৃন্ময় ভাবিল।

ইহার চেয়ে সহজ কোন চিন্তা বা পথের সন্ধান আপাতত তাহার মিলিল না। তা ছাড়া যেখানে···সুনির্ম্মল, রুবি, তাহার আত্মীয়পরিজন রহিয়াছে, তাহার ত্রিসীমানার মধ্যেও সে থাকিতে ইচ্ছুক নয়। সকলের চোখের সম্মুখে হইতে সে একেবারে মুছিয়া যাইতে চায়, নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে চায়।

মৃন্ময় সহসা শিয়ালদহগামী বাসে উঠিল। আপাতত গতি তাহার ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

২০

গ্রামের আবহাওয়া মঞ্জুষার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি জ্ঞাপন···তাহার বাবাকে একই প্রশ্ন বারে বারে করা, অনুকম্পার দৃষ্টিতে মঞ্জুষার পানে চাহিয়া থাকা তাহার কাছে যেমন ঠেকিত বিরক্তিকর, তেমনি মনে হইত অপমানজনক। ফলে মৃন্ময়ের প্রতি মঞ্জুষার মন অধিকতর বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কতকটা আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে ও

আত্মগ্লানিতে যখন সে ম্রিয়মাণ তখনই মঞ্জুষার বাবার তরফ হইতে বিদেশে যাইবার প্রস্তাব আসিল। সে বাঁচিয়া গেল।

গ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রথমে তাহারা কলিকাতায় আসিল। কিন্তু এখানকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহারা নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছিল না। অথচ কথাটা কেহই মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতেছে না। জীবানন্দ ভাবিতেছেন মঞ্জুষার কথা, আর মঞ্জুষা তার বাবার কথা। একে অপরের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া মৌন হইয়া আছে। মঞ্জুষা ভাবে, তাহার বাবা হয়তো শহরের এই কোলাহলের মাঝে নিজেকে খানিকটা অন্যমনস্ক রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। জীবানন্দের মনের চিন্তাধারাও ঠিক একই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আহা, মেয়েটার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

কিন্তু দিন যতই চলিয়া যাইতে থাকে মঞ্জুষা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য অনুভব করে। যে আশা অতি সঙ্গোপনে মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহাও আজ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করিল না। তার প্রত্যেকটি গোপন প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে মঞ্জুষা আরও বেশী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে! অথচ তাহার মনের কথা কাহারও নিকট খোলাখুলি প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার অছিলায় বহুস্থানেই মঞ্জুষা খবর লইয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বরং নিদারুণ ব্যর্থতা তাকে প্রতিপদেই ভিন্ন পথে চিন্তা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। তার নারীত্বের মর্য্যাদা হইয়াছে আহত। মনের কোণের ক্ষীণতম আশাও শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট রহিল না।

মঞ্জুষা নিজেকে সহস্র রকমে ধিক্কার দেয় তাহার এই চিত্তদৌর্ব্বল্যের জন্য। পিতাকে প্রকাশ্যে বলে, তোমার বোধ হয় এখানকার জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না বাবা?

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, এ কথা কেন মা? আমি ত বেশ ভালই আছি।

মঞ্জুষা বলে, এর নাম কি ভাল থাকা বাবা? তোমার চেহারা দিন দিন কি হচ্ছে তা কি দেখছ না?

জীবানন্দ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আমিও যে ঠিক এই কথাটাই ক' দিন ধরে তোমায় বলব ভাবছিলাম মঞ্জু।

মঞ্জুষা জোর করিয়া একটু হাসিল। গভীর কণ্ঠে বলিল, এ ভাবে আমার কথাটা তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করো না বাবা। অন্তত আমার দিকে চেয়েও তোমার নিজের কথা ভাবা উচিত।

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, আমি ত তোমার কোন কাজে বাধা দিই না মা!

মঞ্জুষা নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। অনর্থক পিতাকে এ ভাবে বিব্রত করিয়া সে আত্মগ্লানি অনুভব করিল। কতবড় ব্যথা যে তার বৃদ্ধ পিতা নিঃশব্দে বহন করিয়া ফিরিতেছেন একথা মঞ্জুষার চেয়ে বেশী ত আর কেহ জানে না। তথাপি কেন এই মিথ্যা ছলনা!

মঞ্জুষা লজ্জিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, আমি ত সে কথা বলছি না বাবা। আমি ভাবছিলাম এখানকার জলবায়ু যখন আমাদের সহ্য হচ্ছে না তখন না হয় অন্য কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া যাক। এখানকার এই হৈ-চৈ আমারও আর ভাল লাগছে না।

জীবানন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, অতি উত্তম কথা মা। আজই তা হলে তৈরি হয়ে নাও। কথা কয়টি তিনি এমন ভাবে বলিলেন যেন এই মুহূর্ত্তে রওনা হইতেও তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

মঞ্জুষা পিতার এই অস্বাভাবিক আগ্রহে মনে মনে ব্যথিত হইল। পিতার স্নেহপ্রবণতার উপর কত অন্যায় আব্দার সে করিতেছে। প্রকাশ্যে

কহিল, আজ আর সম্ভব হবে না বাবা! তা ছাড়া দিনটাও আজ মোটেই ভাল নয়।

জীবানন্দ বার কয়েক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এক সময় বড্ড মেনে চলতাম, কিন্তু আজ আর ভাবতেও ভাল লাগে না। আমার ভাল যে চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, এসব ত তোমার কথা নয় বাবা! এত সহজেই আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলব কেন? আমাদের আজন্মের বিশ্বাস এই সামান্য কারণে ক্ষুণ্ণ হতে দেব কিসের জন্য!

জীবানন্দ পুনরায় ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ মাথা নাড়িলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, আজন্মের বিশ্বাস···সামান্য কারণ···আচ্ছা মা···থাক্ মঞ্জু···কিন্তু যাওয়ার ব্যবস্থা দু'এক দিনের মধ্যেই করে ফেল। শরীরটা বোধ হয় সত্যিই আমার খুব খারাপ যাচ্ছে।

মঞ্জুষা পিতার নিকটে আগাইয়া আসিল। আলগোছে তার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমি শুধু আজকের দিনের কথাই বলছিলাম। নইলে আমি নিজেও যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি বাবা। আমরা কালই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।

পুনরায় নূতন করিয়া তাহাদের যাত্রা শুরু হইল। ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুষার মন উধাও হইয়া চলিয়াছে বহু দূরের নানা স্মৃতির রাজ্যে। সে দিনগুলি তার জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না; শুধু ফেলিয়া গেছে স্মৃতি···বেদনা···জ্বালা। মঞ্জুষার মনে কত চিন্তাই না আনাগোনা করিতেছে। মৃন্ময়ের প্রতি কখনও অনুকম্পা দেখা দেয়, কখনও একটা হিংস্র প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি তাহর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার কল্পনা শুধু তাহাকেই ব্যঙ্গ করে—আপন অন্তরে আপনিই শুধু জ্বলিয়া মরে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই।

সবার চেয়ে ভয় মঞ্জুর বাবাকে লইয়া। এ কথা সে ভাল করিয়াই জানে —কতখানি ব্যাকুল আগ্রহে তিনি দিবারাত্র মঞ্জুষার চালচলন কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

মঞ্জুষা প্রাণপণে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। তথাপি মাঝে মাঝে সে ধরা পড়িয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অভিনয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। অন্ততঃ মঞ্জুষা তাহা পারিতেছে না।

কত কথাই একের পর এক তার মনের কোণে উঁকি মারিতেছে। তাদের আদর্শ পরিকল্পনার কথা, ভবিষ্যৎ জীবনে স্বর্গরচনার কথা। যে স্বর্গে তথাকথিত ছোট-বড়র প্রভেদ থাকিবে না, তাদের মধ্যে ওরা নামিয়া যাইবে উহাদিগকে নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে। সাড়া পাইয়া আরও কত কথা তার মনে আলোড়ন তুলিয়াছে। আজিকার এই পরিণতির কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই অতীতের বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা একের পর এক সার বাঁধিয়া তার চোখের সম্মুখে রূপ পরিগ্রহ করে। তাকে অস্থির করিয়া তোলে।···

হায়রে, কোথায় গেল তাদের সে কল্পনার মায়াসৌধ? এমনি করিয়াই কি সবকিছু ব্যর্থ হইয়া যাইবে? কিন্তু কেন? কিসের জন্য? মঞ্জুষা একথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পায় না। শুধু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লক্ষ্যহারার মত সে তার বাবাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দার্জ্জিলিঙের গিরিকান্তার, পুরীর সমুদ্র, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, এগুলির কিছুতেই তার প্রয়োজন নাই। তবুও সে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনকে আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়া বাহিরে তার এই অনির্দ্দিষ্ট পথ-চলা।

শেষ পর্যন্ত জীবানন্দকেও এক দিন বাধা দিতে হইল। মৃদু প্রতিবাদ করিয়া তিনি কহিলেন, এমনি করে নিজেদের ক্ষতি করায় কোন লাভ নেই মঞ্জু। তার চেয়ে বরং গ্রামেই ফিরে যাই চলো।

মঞ্জুষা প্রথমে তার বাবার কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু মুহূর্ত্তেই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া মৃদু শান্ত কণ্ঠে কহিল, আজ হঠাৎ এ কথা কেন বাবা?

জীবানন্দ কহিলেন, এর নাম ত বায়ুপরিবর্ত্তন নয় মা!

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া লইয়া কহিল, কথাটা তুমি মিথ্যে বলো নি বাবা। বহু পূর্ব্বেই আমার একথা বোঝা উচিত ছিল যে, আমার পক্ষে যেটা অনায়াসসাধ্য তোমার পক্ষে তা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু গ্রামে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। তার চেয়ে বিদেশেই কোথাও স্থির হয়ে বসো বাবা।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই। পুরীতেই তাহারা তখনকার মত রহিয়া গেল।

মঞ্জুষা তার বাবাকে লইয়া রোজই একবার করিয়া বাহির হয়। কখনও সমুদ্রতীরে, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে। অবসর সময় দেশ-বিদেশের গল্পে পিতাপুত্রী সময় কাটাইয়া দেয়। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন।

মঞ্জুষা যেন একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে। জীবানন্দ শঙ্কিত হইয়া উঠেন। মেয়েকে কাছে ডাকিয়া অনুযোগ দেন। মঞ্জুষা হাসিয়া তা লাঘব করিবার চেষ্টা করে। বলে, এ তোমার দৃষ্টিভ্রম বাবা। স্নেহে তুমি অন্ধ হয়ে গেছ। এখানে ত আমি বেশ ভালই আছি।

জীবানন্দ সংগোপনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। পিতাপুত্রীর মধ্যে এই ধরণের ছলনার অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই।

জীবানন্দ মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া বার কয়েক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, মিথ্যে আমায় ভুলাতে চাইছ মঞ্জু, কিন্তু দোহাই তোমার, এমনি করে আমায় কষ্ট দিও না মা।

মঞ্জুষা বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। বরং পুরাতন ক্ষত আবার নূতন ভাবে জ্বালা করিয়া উঠে। কি সে করিবে! কতখানি ক্ষমতা তার, পিতাকে এই সর্ব্বনাশা দুর্ভাবনা হইতে কেমন করিয়া সে মুক্তি দিবে। নিজের কথা সে আর ভাবিতে চাহে না। এই ভাবনাই যে তাদের জীবনযাত্রাকে নিরন্তর জটিল করিয়া তুলিতেছে! ভাবিব না মনে করিলেই ত তার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

এমনি নানা চিন্তায় মঞ্জুষার মন যখন ভারাক্রান্ত···নিতান্ত অন্ধের মত সে যখন তার ভাবী পথের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে তখন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নান্কুর সাক্ষাৎ মিলিল জগন্নাথ-মন্দিরে। মঞ্জুষা নিজে হইতে না ডাকিলে নান্কুর কাছে হয়তো সে অপরিচিতাই থাকিয়া যাইত। বহু বৎসর পূর্ব্বে দেখা বালিকা মঞ্জুষার সহিত আজিকার মঞ্জুষার কোথাও একবিন্দু সাদৃশ্য নাই। তাই মঞ্জুষা যখন অনুযোগ দিয়া কহিল, না ডাকলে বোধ হয় চিনতেই পারতে না?···তখন কথাটা নীরবে মানিয়া লইয়া হাসিমুখে নান্কু কহিল, খুব সত্যি কথা, কিন্তু তার জন্য আমাকে অনুযোগ দেওয়া চলেনা। এক যুগ আগের মঞ্জু যে কত ছোট ছিল তা সে ভুলে গেলেও আমি ভুলি নি। কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ যে এখানে পাব এ আমার স্বপ্নের অতীত। কত খুশী যে হয়েছি সে তুমি কল্পনা করতেও পারবে না।

ইহার পরে সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে নানা আলোচনা হইল। তাদের পারিবারিক বিপর্য্যয়ের কথা, গ্রামের কথা, রাধু বোষ্টমের কথা। মৃন্ময়ের কথাটা মঞ্জুষা ইচ্ছা করিয়াই তুলিল না। কিন্তু মঞ্জুষা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চাহিলেও নান্কুর তার সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ আছে এবং তাদের ভিতরের গোলযোগের কোন খবরও সে রাখে না। কাজেই সে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, মিনুর কথা ত কিছু বললে না মঞ্জু?···

মঞ্জুষা মুহূর্ত্তের জন্য একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেও অল্পেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, সে কথা এক মস্ত বড় ইতিহাস নান্কুদা। এখানে এই জনতার মাঝে তা নাই বা শুনলে। আমাদের বাড়ী চল সেখানে গিয়ে সব বলব। বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাঁকে নিয়েই এখানে আছি। কিন্তু তুমি কোথায় আছ সে কথা ত বললে না?

নান্কু বলিল, হোটেলে।

মঞ্জুষা কহিল, আর ত হোটেলে থাকা তোমার চলবে না।

নান্কু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, কেন!

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, আমরা এখানে থাকতে তুমি থাকবে হোটেলে? এ কখনও হতে পারে না। লোকে শুনলেই বা বলবে কি?

নান্কু প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ হাসিল, বলিল, লোকের কথায় গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

নান্কুর কথার ধরণে মঞ্জুষাও হাসিয়া উঠিল। কহিল, কিন্তু আমাদের পড়ে। তা ছাড়া এই বিদেশে একবার যখন তোমার দেখা পেয়েছি তখন তোমার কোন আপত্তিই শোনা হবে না।

আপত্তি শেষ পর্য্যন্ত নান্কু করে নাই। তার সামান্য জিনিষ পত্র লইয়া সেই দিনই সে হোটেল ত্যাগ করিল।

২১

অকস্মাৎ মঞ্জুষার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এ তাহার সম্পূর্ণ এক পৃথক মূর্ত্তি যাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে কাহারও পরিচয় ঘটে

নাই। নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। অন্ততঃ তাহার বিগত কয়েক বৎসরের জীবনধারার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারা ইহাতে শুধু বিস্মিতই হইলেন না, শঙ্কিতও হইয়া উঠিলেন। কন্যার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবানন্দ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। অথচ মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার কোথায় যেন বাধিতেছে।

মঞ্জুষা নান্টুকে লইয়া এমন ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে যে, কোনদিন কোন কারণে মঞ্জুষার জীবন-পথে যে কোন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে একথা বুঝিবার উপায় নাই। নান্টুর ওঠা, বসা, শোয়া, খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সান্ধ্য ভ্রমণ পর্য্যন্ত মঞ্জুষার নির্দ্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। হাসি, গল্পে দিনগুলি সরস এবং জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, ছায়ার ন্যায়, তাহাকে সর্ব্বক্ষণ অনুসরণ করিতেছে। নান্টু সব খবর রাখে না। রাখিবার কথাও নয়। এত দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে কোথায় কি ঘটিয়াছে তাহা জানিবার সুযোগ তাহার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। অনাত্মীয়দের মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে। তাই মঞ্জুষার আজিকার আচরণ আদৌ অসঙ্গত বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। বরং পুরীর নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা তাহার সুষ্ঠু হইয়া উঠিয়াছে। নান্টুর ভাল লাগে। সময় সময় নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে হয়। একসঙ্গে অনেক কথা ভাবিয়া দেখে। বিগত দিনের বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা একের পর এক সার বাঁধিয়া তাহার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। নিজের কথা নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। মঞ্জুষার বর্ত্তমান আচরণ তাহাকে বহু বিষয়ে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু নান্টুর জীবনাদর্শ ত এই পথ ধরিয়া সার্থক হইয়া উঠিবে না বরং মুক্ত জীবনের যে স্বাচ্ছন্দ্য সে এতদিন উপভোগ করিয়া আসিয়াছে মঞ্জুষা কি তাহারই চতুর্দ্দিকে গণ্ডী টানিয়া দিয়া তাহার নিষ্কৃতির পথে বাধার সৃষ্টি করিতে উদ্যত হয় নাই? নান্টু কোন দিনই বন্ধনকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই, তাই আজও

সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বন্ধনের মধ্যে যখনই সে সুখের সন্ধান করিয়াছে তখনই নিদারুন ব্যর্থতা তাহাকে নির্ম্মম আঘাত হানিয়াছে। ইহাই নান্টুর অদৃষ্টলিপি।

লীলাকে নান্টু কোনদিন বন্ধনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চায় নাই—তাই সে আজও নান্টুর ছুর্দ্দিনের বান্ধবী। নিজেকে লইয়া খেয়াল-খুশীমত দিন কাটাইলেও তাহার প্রতি আজও লীলার সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। নান্টুর সুখ-সুবিধার জন্য সে উদ্‌গ্রীব। পথ নির্ব্বাচনে নান্টুর সহিত মতের মিল না হইলেও বন্ধুত্ব তাহাদের আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হাসিমুখেই উভয় উভয়কে বিদায় দিয়াছে। তারপরেই নূতন করিয়া আবার সুরু হইয়াছে নান্টুর যাযাবর জীবন। কিন্তু বহুদিনের অনায়াস জীবন যাপনের পর আজ আবার পথ চলিতে সুরু করিয়া নান্টু বড় ক্লান্তি বোধ করিল। শরীরটাও কিছুদিন যাবৎ ভাল যাইতেছিল না, মনটাও তাই থাকিয়া থাকিয়া একটি নিরুপদ্রব আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। আর এমনি সময়েই মঞ্জুষার সহিত তাহার দেখা। শুধুই কি দেখা—তার পর হইতেই স্নেহে এবং সেবায় সে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নান্টু পরম তৃপ্তি বোধ করে। লীলা আর মঞ্জুষাকে পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখে। একটা নূতন চেতনা তাহার মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। পরমুহূর্ত্তেই সে নিজেকে মনে মনে শাসন করে। তার মত ভবঘুরের আবার এ চিন্তা কেন? সংসারের কাছে কতখানি মূল্য তার? বিশেষ করিয়া কথাটা সে শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিতে পারে না। মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে—এ অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবই একদিন সম্ভব হইল। মঞ্জুষার আগ্রহ এবং যুক্তির কাছে নান্টু এবং জীবানন্দ উভয়কেই হার মানিতে হইল।

মৃন্ময়কে সমুচিত শিক্ষা দিবার যে প্রবৃত্তি মঞ্জুষার মধ্যে এতদিন

সঙ্গোপনে বাসা বাঁধিয়াছিল নান্তুকে কাছে পাইয়া আজ তাহাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

জীবানন্দ সব কথাই শুনিলেন এবং নিভৃতে ডাকিয়া মঞ্জুষাকে কহিলেন—আমাকে কোন কথা লুকোবার চেষ্টা করো না মঞ্জু!···

একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোমার মা আজ বেঁচে নেই, তাই এ গুরু দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হচ্ছে।

মঞ্জুষা মৃদু শান্ত কণ্ঠে কহিল, একের অন্যায়ের বোঝা আর এক জন আজীবন অকারণে বয়ে বেড়াক এইটেই কি তুমি চাও বাবা?

জীবানন্দ বলিলেন, আমি চাইলেও তোমরা সে কথা মানবে কেন মা। কিন্তু কথাটা তা নয় মঞ্জু, নিজেকে খুব ভাল করে বুঝে দেখে চরম সিদ্ধান্ত করো। অনেক ঠেকে এবং অনেক ঠকে আমাকে আজ এ কথা বলতে হচ্ছে।

ইহার পরে জীবানন্দ আর দ্বিতীয় কথা বলেন নাই। কন্যার বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নীরব রহিলেন।

মঞ্জুষা কিন্তু থামিতে পারিল না। বলিল, আমি হঠাৎ কিছু স্থির করি নি বাবা। অনেক ভেবেই আজ এ কথা বলছি।

জীবানন্দ নিরুত্তর। মঞ্জুষা কহিল. তোমার এভাবে চুপ করে থাকা চলবে না বাবা। খোলা মনে একটা জবাব দাও।

জীবানন্দ আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন, তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি নিজের কাছেই পাবে। আমায় অকারণে বিব্রত করো না। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে তোমার সিদ্ধান্তই সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয়। নিজের মন যদি পরিষ্কার থাকে ভগবান নিশ্চয় তোমাদের মঙ্গল করবেন।

এর বেশী জীবানন্দ আর একটি কথাও বলিলেন না। কিন্তু মঞ্জুষা এইখানেই থামিতে পারিল না। সে ক্রমাগতই ভাবিতেছে—ভাবিতেছে অনেক কথা। নান্টুকে সে বিবাহ করিবে। কাগজে কাগজে খবরটা চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞাপিত হইবে। মৃন্ময় দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়া লউক, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করুক যে, তাহাকে ছাড়াও মঞ্জুষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এটা ভালই হইল যে, একটা দুশ্চরিত্র প্রবঞ্চককে তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে হয় নাই। ভগবান তাহাকে খুব বাঁচাইয়াছেন। নান্টুর আর যত দোষই থাকুক মৃন্ময়ের মত প্রবঞ্চনা সে করিবে না। সত্য কথা বলিবার সৎসাহস তাহার আছে, কিন্তু মৃন্ময়ের তাহাও নাই। তাই আজ তাহার আত্মগোপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। মিথ্যা অভিনয়ে সে তাহাকে আগাগোড়া ফাঁকি দিয়াছে। কিন্তু মঞ্জুষা নিজের জীবনের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবেই। নান্টুকে আজ সেইজন্যই তাহার একান্ত প্রয়োজন।

নিজেকে মঞ্জুষা এমনি করিয়াই বুঝাইতেছে অথচ এই সোজা কথাটা সে ভাবিয়া দেখিতেছে না যে, মৃন্ময়ের অন্তর্দ্ধানে যদি তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধিই না হইয়া থাকে তাহা হইলে এত যুক্তির অবতারণা করিবার কিসের প্রয়োজন; নিজের মনকে সহস্র রকমে যাচাই করিয়া দেখিবার এই প্রয়াসই বা কিসের জন্য। সোজাসুজি এক জনকে জীবন-সঙ্গী রূপে বরণ করিয়া লইলেই ত সব হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। কেন তবে মিথ্যা এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া বেড়ানো—কেনই-বা মৃন্ময়কে কেন্দ্র করিয়া এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের চেষ্টা।

মঞ্জুষা ভাবে কেন বাবা আজ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাহার ইচ্ছাকে এক কথায় মানিয়া লইতে পারিলেন না কিসের জন্য? তাহার মনের একান্ত গোপন কথাটি কি তাহা হইলে আর তাহার পিতার অগোচর নয়।

মঞ্জুষা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। গভীর রাত। সমস্ত বাড়ীখানি সুষুপ্তির কোলে নিমগ্ন। একা হয়ত শুধু সে-ই জাগিয়া আছে। তাহার জীবনে আর একটি সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর ফিরিবার কোন উপায় নাই, ফিরিতে সে চায়ও না। এমনই এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে! মঞ্জুষা পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া যাইতে চায় - যেখানে সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের একটি চমৎকার পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মঞ্জুষা তাহার আদর্শকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। তাহার কল্পনাকে সে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে। গ্রামে তাহাকে ফিরিতেই হইবে।

মঞ্জুষা লঘুপদে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল এবং একসময় সে খোলা জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, আলোর লেশমাত্র কোথাও নাই। মঞ্জুষার মনের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির এক গভীর যোগ রহিয়াছে যেন। সে ভাবে, অদৃষ্ট আজ কোথায় তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহার চলার পথে কি আলোর সন্ধান পাওয়া যাইবে না!

আজ এই নিস্তব্ধ নিশীথে একলা ঘরে বসিয়া মঞ্জুষার কত কথাই মনে পড়িতেছে। অতীতের প্রতিটি দিনের ইতিহাসই কি তাহার জীবনের ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মৃন্ময়ের আচরণ চিরদিনই কি শুধু ফাঁকির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একথা ভাবিতেও যে মঞ্জুষার বুক ভাঙিয়া যায়। তাহার নিজের জন্য নয়—মৃন্ময়ের জন্য। এত ছোট সে কেমন করিয়া হইতে পারিল। মঞ্জুষার অন্তরাত্মা চীৎকার করিয়া ওঠে—এ অসম্ভব···এ মিথ্যা, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিষ্ঠুর বাস্তব নির্ম্মম আঘাতে তাহার কল্পনার সৌন্দর্য্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। মঞ্জুষা আর ভাবিতে পারে না। ধীর ভাবে কোনকথা চিন্তা করিবার স্থৈর্য্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার

চতুষ্পার্শ্বে এক মহাশূন্যতা বিরাজ করিতেছে। অধীর আগ্রহে সে পায়ের তলায় মাটির সন্ধান করিতেছে। তাহাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, মানুষের মত বাঁচিতে হইবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে।

আজ এই বিদেশে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সবই যেন নিরর্থক। তাহার জীবনে কোনকিছুরই প্রয়োজন নাই। অপরের দুষ্কৃতি, কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া কিসের জন্য এমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমনি করিয়া আত্মপীড়ন করিবার কতটুকু প্রয়োজন তাহার আছে। কোন্ অধিকারে সে বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া দেশদেশান্তরে নিরর্থক ছুটাছুটি করিতেছে। আজ সবকিছুরই সে অবসান করিবে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যত প্রশ্ন এবং সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সবগুলির মীমাংসা করিয়া ছাড়িবে।

নান্টু আপত্তি তুলিয়াছিল। বন্ধনের মধ্যে সে তাহার গতিকে ব্যাহত করিতে রাজী নয়। নান্টুকে মঞ্জুষার প্রয়োজন সেইজন্যই আরও বেশী, এবং সেইজন্যেই তাহার এইরূপ আয়োজন। ভাবী জীবনে নিজের চলার পথকে মঞ্জুষা বাছিয়া লইয়াছে। এর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। তাহার নিজের জন্যও বটে এবং বৃদ্ধ পিতার জন্যও বটে। তা ছাড়া এমনি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানোই বা যায় কি করিয়া। জীবনে সুখ, দুঃখ, ভুল, ভ্রান্তি না আছে কোথায়। শুধু দুঃখকেই সে সারা জীবন বহন করিয়া ফিরিবে কিসের জন্য? কার আশায় সে এই মূল্যবান দিনগুলির অপচয় করিতেছে। এক অব্যবস্থিতচিত্ত যুবক— যাহার কাছে ভালবাসা, প্রেম, প্রীতির মূল্য শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে।

•

একই প্রশ্ন নানা রূপে তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। ফলে একটা প্রবল অস্বস্তি তাহার চিন্তা ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে আর পারে না, সত্যই আর ভাবিতে পারে না।

মঞ্জুষা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। এই মুহূর্ত্তে নিজেকে বড় অসহায়, বড় দুর্ব্বল মনে হইল। ক্লান্তিতে দুই চোখ বুজিয়া আসে—শয্যার আশ্রয় লইলে ঘুম আসে না। আরও কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইয়া সে বাথরুমে প্রবেশ করিল। মাথার ভিতরটা তাহার যেন একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। মাথায় কিছুক্ষণ জলের ধারা দিয়া পুনরায় সে শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। এখন সে কতকটা স্বস্তি বোধ করিল।

নান্কুর ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। মঞ্জুষা জ্বালায় নাই। আলো সে সহ্য করিতে পারিতেছে না বলিয়াই। নান্কুর কথা আলাদা। তার ভবিষ্যৎ জীবনে নূতন আলোর সঙ্কেত। মঞ্জুষা তার ঘরের পাশ দিয়া চলিতে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য থামিল। অজ্ঞাতে একটি নিঃশ্বাস পড়িল। ভবিষ্যতের উপর মানুষের কতটুকু অধিকার। কি সে কল্পনা করিয়াছিল আর বাস্তবে কি আজ ঘটিতে চলিয়াছে। মৃন্ময়কে কেন্দ্র করিয়া যে নীড়-রচনার স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল মঞ্জুষার জীবনে তাহা কি নিছক স্বপ্ন হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে। এ স্বপ্ন স্থায়ী হইবে তাহার জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নয়—মনের নিভৃত প্রদেশে, যেখানে অপরের প্রবেশাধিকার নাই। মঞ্জুষা তার ব্যক্তিসত্তাকে এমনি দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিবে।

অকস্মাৎ মৃন্ময়ের উপর মঞ্জুষার মনটা যেন অনেকখানি নরম হইয়া আসিল।

মৃন্ময় মঞ্জুষাকে বলিত, অযথা অবিশ্বাস করো না মঞ্জু—তাতে নিজেদেরই বেশী করে ঠকানো হবে।...কথাটা আজও থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে পড়ে। রেশটা নিরন্তর অনুরণিত হইয়া উঠে।

চতুষ্পার্শ্বে এক মহাশূন্যতা বিরাজ করিতেছে। অধীর আগ্রহে সে পায়ের তলায় মাটির সন্ধান করিতেছে। তাহাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, মানুষের মত বাঁচিতে হইবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে।

আজ এই বিদেশে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সবই যেন নিরর্থক। তাহার জীবনে কোনকিছুরই প্রয়োজন নাই। অপরের দুষ্কৃতি, কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া কিসের জন্য এমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমনি করিয়া আত্মপীড়ন করিবার কতটুকু প্রয়োজন তাহার আছে। কোন্ অধিকারে সে বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া দেশদেশান্তরে নিরর্থক ছুটাছুটি করিতেছে। আজ সবকিছুরই সে অবসান করিবে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যত প্রশ্ন এবং সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সবগুলির মীমাংসা করিয়া ছাড়িবে।

নাস্কু আপত্তি তুলিয়াছিল। বন্ধনের মধ্যে সে তাহার গতিকে ব্যাহত করিতে রাজী নয়। নাস্কুকে মঞ্জুষার প্রয়োজন সেইজন্যই আরও বেশী, এবং সেইজন্যেই তাহার এইরূপ আয়োজন। ভাবী জীবনে নিজের চলার পথকে মঞ্জুষা বাছিয়া লইয়াছে। এর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। তাহার নিজের জন্যও বটে এবং বৃদ্ধ পিতার জন্যও বটে। তা ছাড়া এমনি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানোই বা যায় কি করিয়া। জীবনে সুখ, দুঃখ, ভুল, ভ্রান্তি না আছে কোথায়। শুধু দুঃখকেই সে সারা জীবন বহন করিয়া ফিরিবে কিসের জন্য? কার আশায় সে এই মূল্যবান দিনগুলির অপচয় করিতেছে। এক অব্যবস্থিতচিত্ত যুবক—যাহার কাছে ভালবাসা, প্রেম, প্রীতির মূল্য শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে।

একই প্রশ্ন নানা রূপে তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। ফলে একটা প্রবল অস্বস্তি তাহার চিন্তা ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে আর পারে না, সত্যই আর ভাবিতে পারে না।

মঞ্জুষা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। এই মুহূর্ত্তে নিজেকে বড় অসহায়, বড় দুর্ব্বল মনে হইল। ক্লান্তিতে দুই চোখ বুজিয়া আসে—শয্যার আশ্রয় লইলে ঘুম আসে না। আরও কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইয়া সে বাথরুমে প্রবেশ করিল। মাথার ভিতরটা তাহার যেন একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। মাথায় কিছুক্ষণ জলের ধারা দিয়া পুনরায় সে শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। এখন সে কতকটা স্বস্তি বোধ করিল।

নান্কুর ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। মঞ্জুষা জ্বালায় নাই। আলো সে সহ্য করিতে পারিতেছে না বলিয়াই। নান্কুর কথা আলাদা। তার ভবিষ্যৎ জীবনে নূতন আলোর সঙ্কেত। মঞ্জুষা তার ঘরের পাশ দিয়া চলিতে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য থামিল। অজ্ঞাতে একটি নিঃশ্বাস পড়িল। ভবিষ্যতের উপর মানুষের কতটুকু অধিকার। কি সে কল্পনা করিয়াছিল আর বাস্তবে কি আজ ঘটিতে চলিয়াছে। মৃন্ময়কে কেন্দ্র করিয়া যে নীড়-রচনার স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল মঞ্জুষার জীবনে তাহা কি নিছক স্বপ্ন হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে। এ স্বপ্ন স্থায়ী হইবে তাহার জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নয়—মনের নিভৃত প্রদেশে, যেখানে অপরের প্রবেশাধিকার নাই। মঞ্জুষা তার ব্যক্তিসত্তাকে এমনি দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিবে।

অকস্মাৎ মৃন্ময়ের উপর মঞ্জুষার মনটা যেন অনেকখানি নরম হইয়া আসিল।

মৃন্ময় মঞ্জুষাকে বলিত, অযথা অবিশ্বাস করো না মঞ্জু—তাতে নিজেদেরই বেশী করে ঠকানো হবে।...কথাটা আজও থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে পড়ে। রেশটা নিরন্তর অনুরণিত হইয়া উঠে।

মঞ্জুর বাবা বলেন ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া শেষ সিদ্ধান্তে পৌছাইতে। কিন্তু কি সে ভাবিয়া দেখিবে। ভাবনার আছেই বা কি···তাতে সার্থকতা কতটুকু। যে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা মৃন্ময়ের জন্য তার অন্তরে জমা হইয়া আছে, অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে দুই পায়ে সে তাহাকে মাড়াইয়া দিয়াছে। মঞ্জুষা বিস্মিত হইয়াছে, ব্যথা পাইয়াছে। তাহার বুকের ভিতরটা খালি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকেও ত বাঁচিতে হইবে।

মঞ্জুষা আপন সিদ্ধান্তকে নিজেই মানিয়া লইতে পারিতেছে না, তাই সহস্র রকমে বিচার করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু এই দেখারও এক দিন পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু শেষ হইয়াও পুনরায় যে পরিস্থিতি মঞ্জুষার সম্মুখে দেখা দিল তাহা নূতন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎকে এক ঘোরতর বিপর্য্যয়ের মধ্যে টানিয়া আনিল।

২২

অত্যন্ত অনাড়ম্বরে নান্কুর সহিত মঞ্জুষার বিবাহ হইয়া গেল। নান্কুর হাতের মধ্যে মঞ্জুষার হাতখানি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সারা দেহ যেন তাহার পাষাণ হইয়া গিয়াছে। মন চলিয়া গিয়াছে বহু দূরে যেখানে মৃন্ময়কে ঘিরিয়া তাহার সমস্ত সত্তা কল্পনায় এক স্বর্গলোক রচনা করিয়াছিল। সে স্বর্গে ছিল সঙ্গীতের প্রাণময় মূর্চ্ছনা, জীবনের সাবলীল

গতিবেগ, প্রাণ-প্রাচুর্য্যের সুষ্ঠু প্রকাশ, নীড়-রচনার উদগ্র ব্যাকুলতা। ছিল বিশ্বাস, ছিল পরিতৃপ্তি। কথা গানের সুরে ঝঙ্কার তুলিত—বিরহ বহন করিয়া ফিরিত এক অপূর্ব্ব অনুভূতি—বেদনার সঙ্গে পুলক। আজ আর মৃন্ময়কে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা করিবার পথ অবশিষ্ট নাই। নিজের হাতে সে পথ মঞ্জুষা রুদ্ধ করিয়াছে।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে আচম্বিতে তাহার মনে হইল—কাজটা হয় তো সে ভাল করে নাই। নান্কুর সম্বন্ধে তাহার এক গুরু দায়িত্বের সৃষ্টি হইয়াছে—যে দায়িত্ব বহন করা তাহার অবশ্য প্রতিপাল্য সামাজিক কর্ত্তব্য। তাহার এই দেহটার উপর...মঞ্জুষা মনে মনে অনুভব করিল আজ আর একজনের সম্পূর্ণ অধিকার। ভাবিতে গিয়া মঞ্জুষা শিহরিয়া উঠিল। নান্কু তাহার হাতের মধ্যেও সে কম্পন স্পষ্ট অনুভব করিল। সে বিস্মিত হইল। মনের মধ্যে কিসের একটা অস্পষ্ট আভাস অনুভব করিল। একটা ক্ষীণ সন্দেহ তাহার মনকে নাড়া দেয়। মুহূর্ত্তের জন্য সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে।

বাকী রাতটা একই শয্যায় পাশাপাশি থাকিয়া বলি বলি করিয়াও নান্কু মঞ্জুষাকে কোন প্রশ্ন করিল না। এক অখণ্ড নীরবতা দু'জনের মাঝে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে নিকট-সান্নিধ্য সত্ত্বেও আলাদা করিয়া রাখিল। মঞ্জুষা বাঁচিয়া গেল। নান্কুকে মনে মনে দিল ধন্যবাদ। কিন্তু পরের দিনের ঘটনাস্রোত তাহাকে শুধু বিস্মিতই করিল না, ব্যথিত এবং বিভ্রান্ত করিয়াও তুলিল। মঞ্জুষা এ কি করিয়া বসিল।···বিবাহ তাহাদের হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কুশণ্ডিকা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। ..

মঞ্জুষা ভাবিতেছিল, রাধুর এই চিঠিখানা আর একটা দিন আগে তার হাতে আসিয়া পৌঁছিল না কেন?

তিন-চারি স্থান হইতে ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইয়া বহু বিলম্বে আসিয়া পৌছিয়াছে। রাধু লিখিয়াছে :—

মঞ্জু দিদি,

এখান থেকে গিয়ে অবধি আজ পর্য্যন্ত কোন খবর দাও নি। অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি দিলাম। তোমরা এখান থেকে যাবার দিনকয়েক পরেই দাদাঠাকুর এখানে এসেছিল। মনে হ'ল, তোমাদের সব খবর আমার কাছ থেকে প্রথম সে পায়। তারপর আবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। সব কথা আমায় খুলে বললে না—শুধু দুঃখ করে জানালে, কেউ আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না—এমন কি মঞ্জুও আমার মুখের একটা জবাব শুনবার জন্যে অপেক্ষা করলে না। দেখে শুনে মনে হ'ল কোথাও একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। আমার এ কথাটা তুমি বিশ্বাস করো দিদি। তার তখনকার মুখের চেহারা দেখলে সবাই আমারই মত একই কথা বলত। আমার বয়েস হয়েছে, অভিজ্ঞতাও কিছু আছে, তা ছাড়া মিনুদাদাকে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। বরাবরই আমার মনে একটা সংশয় ছিল, কিন্তু তার বাবা নিজে এবং তোমাদের মত তার আপন জনরাই যখন তার বিরুদ্ধে রায় দিলে তখন আমার এ নিয়ে কোন কথা না বলাই উচিত মনে হয়েছিল। চুপ করেই ছিলাম এত দিন, আজ মনে হচ্ছে আর নীরব থাকা বোধ হয় সমীচীন হবে না। তোমার এবং মিনুদাদার মনের কথা জানি বলেই একথা বলছি। তাকে ফেরাবার দায় এবং দায়িত্ব তোমারই সবার চেয়ে বেশী। অভিমান করে আর নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না। তোমাকে বেশী কি আর বলব।

তোমাদের অভাব সব সময়ই অনুভব করি। গ্রামের সে দিন আর নেই। আমরা একপ্রকার আছি।

—ইতি রাধু

মঞ্জুষা রাধুর চিঠিখান হাতে করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তাহার চোখের সম্মুখে কোন পথই আজ আর উন্মুক্ত নাই। সে না পারিল মৃন্ময়কে আপন করিয়া ধরিয়া রাখিতে, না পারিতেছে নান্কুকেও সহজভাবে মানিয়া লইতে। অথচ গত রাত্রে নান্কুর সহিতই তাহার অদৃষ্ট জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাধুর এই চিঠি পাইবার পর কেমন করিয়া নান্কুকে সে স্বামীর মর্য্যাদা দিতে পারে? মঞ্জুষার আশেপাশে সব যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। সমাধানের একটা পথই তাহার সম্মুখে খোলা রহিয়া গিয়াছে—একটি মাত্র পথ। মঞ্জুষার দুই চোখ যেন জ্বালা করিতেছে। মাথার মধ্যে কিছুই প্রবেশ করিতেছে না। মঞ্জুষার আজ এ কি হইল! সে কি পাগল হইয়া যাইবে?

কতক্ষণ যে সে রাধুর চিঠিখানা হাতে করিয়া বসিয়া ছিল মঞ্জুষার সে হুঁস নাই। নান্কু যে বহুক্ষণ তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাও সে লক্ষ্য করে নাই। শুধু একটা কথাই বারবার তাহার মাথার মধ্যে তোলপাড় করিয়া চলিয়াছে। এ সে কি করিয়াছে···বহুক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া নান্কুই প্রথমে কথা কহিল, চিঠিতে কি কোন দুঃসংবাদ আছে মঞ্জু?

এই আকস্মিক প্রশ্নে মঞ্জুষা কেমন অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল অর্থহীন দৃষ্টিতে নান্কুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কতকটা যন্ত্রচালিতের ন্যায় চিঠিখানা তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

নান্কু এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিল এবং বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ক্ষণকাল পরে শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, এ কাজ তুমি কেন করলে মঞ্জু? নিজের জন্য আমি এক তিল ভাবি না, দুঃখও করি না। সংসারের বন্ধনকে কোন দিনই আমি চাই নি। ঘটনাচক্রে আজ সে বন্ধনকে মেনে নিলেও

তাকে অস্বীকার করতে দ্বিধা করব না যদি বুঝি তাতে তোমার অথবা মিনুর কোন উপকার হয়। কিন্তু তুমি জেনে শুনে এ কোথায় আমাদের উভয়কে টেনে আনলে। এখন ফেরবার উপায়ও যেমন দেখতে পাচ্ছি না —এগোবার পথও তেমনি দুরতিক্রম্য হয়ে উঠল। অথচ আগাগোড়া তুমি আমায় নিছক মিথ্যেটাকেই সত্য বলে বুঝিয়ে এসেছ। কোন দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে আমার দ্বিধা জাগে নি। মৃন্ময় অন্যায় করেছে এ ভুল করবার যথেষ্ট কারণ তোমার থাকলেও আমাকে এ জটিল আবর্ত্তে তুমি কেন টেনে নামালে। আমি ত কোনদিন তোমার ক্ষতি করি নি মঞ্জু?

নান্টু থামিল। একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মৃন্ময় এখন কোথায় আছে জান- তুমি?

মঞ্জুষা জানাইল, না।

নান্টু কহিল, এই চিঠির কথা তোমার বাবা শুনেছেন?

মঞ্জুষা একই উত্তর দিল।

নান্টু বলিল, এর পরে কি যে আমি করব তা এখনও ঠিক ভেবে উঠতে পারছি নে, তবে বিয়ের পর্ব্ব এখানেই শেষ হ'ল এ কথা ঠিক।

মঞ্জুষা শিহরিয়া উঠিল।

নান্টু বলিয়া চলিল, তোমার বাবাকে সব কথা বলবার ভার আমি নিলাম। মিনুকেও আমি যেমন করে হোক খুঁজে বের করব। তার পরের দায়িত্ব তোমাদের—

নান্টুর কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে মনে মনে সে যেন কিছু একটা স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। মঞ্জুষা একবার

চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে তাহার সহজ জ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

নান্কু পুনরায় সুরু করিল, পুরীতে তোমরা বেশী দিন আস নি। বন্ধুবান্ধবও তোমাদের বড় একটা আছে বলে মনে হয় না। কাজেই আমার মনে হয় আজকেই তোমাদের এ স্থান ত্যাগ করা সব দিক দিয়েই সমীচীন। গত রাত্রের অনুষ্ঠানকে যখন আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না তখন এ ছাড়া আর কোন সহজ পন্থাও আমার চোখে পড়ছে না। মঞ্জুষা পুনরায় চমকাইয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, নারায়ণ সাক্ষী রেখে···এর বেশী আর সে বলিতে পারিল না।

নান্কু বড় অদ্ভুতভাবে একটু হাসিল। শান্ত কণ্ঠে কহিল, নারায়ণ সাক্ষী করে একটা ভুল কাজ করেছি বলেই তা কখনও সত্য হয়ে উঠতে পারে না। আর নারায়ণ সাক্ষী করে তুমিও কিছু আমায় স্বামিত্বে বরণ করে নাও নি। আমি তোমাদের মত আজও পুরোপুরি সাংসারিক জীব হয়ে উঠতে পারি নি, তাই আমার যুক্তিবিচারও আলাদা ধরণের। আমার কাছে যা ভুল তা সব সময়ই ভুল। মোট কথা অন্তরের সত্যই আমার কাছে চরম—কোনদিনই তার অমর্য্যাদা করতে আমি পারব না। বলিয়াই সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মঞ্জুষা একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। সে শক্তিও তাহার নাই। ও শুধু স্থির ভাবে বসিয়া আছে। কি যে একের পর এক ঘটিয়া চলিয়াছে, এর গুরুত্ব যে কতখানি তাহা সে যেন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। শুধু তাহার মনে হইতেছে এখনই হয়তো তার বোধশক্তি লোপ পাইয়া যাইবে।

২৩

একে একে সকল কথাই মৃন্ময় লিলির নিকট ব্যক্ত করিল, কিছুই গোপন করিল না। লিলি একটি কথাও কহিল না। মোটের উপর বলিবার মত কিছু ছিলও না। মানুষের শয়তানী মনোবৃত্তির কথাটাই তখন তার সমস্ত অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

মৃন্ময় বলিতে লাগিল, মঞ্জুষা যে আমার জীবনের পথ থেকে সরে দাঁড়াল তার জন্যে আমি কাউকে অনুযোগ দেব না লিলি। শুধু দুঃখ পাচ্ছি এই ভেবে যে, আমি মঞ্জুষার কাছে অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলাম। আমি ইতর স্বভাবের—এই ধারণাটাই চিরকাল তার মনে থাকবে বদ্ধমূল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে সুরু করিল, সত্য হ'ল তার কাছে মিথ্যার ছলনা। আমি জানি আমাকে ছোট করে ভাবতে বাধ্য হওয়ায় মঞ্জুষা নিজেই হবে সকলের চেয়ে বেশী দুঃখিত এবং ব্যথিত। জীবনে যে পথই সে বেছে নিক না কেন তা যে পরিণামে সুখের হবে না একথা আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। তাইতেই আমি শান্তি পাচ্ছি নে। আমি যেন পাগল হয়ে উঠেছি।

লিলি তথাপি নীরবে নত মস্তকে বসিয়া আছে।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, আমার জীবনের এই অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য কেউই দায়ী নয়। কিন্তু তুমি অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন। এ আমার নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি।

ঘটনাটা আগে থেকে খোলসা করে রাখলে কিছুতেই এমন হতে পারত না। কিন্তু কেমন করে বুঝব আমি যে, ওরা ভাইবোনে অকারণে ষড়যন্ত্র করে আমার এতবড় ক্ষতি করবে। চারদিকে রটিয়াছে আমি তোমায় 'ইলোপ' করেছি। কত বড় লজ্জা এবং ঘৃণার কথা বলো দেখি। এমন অবস্থার সৃষ্টি ওরা করেছে যে, আমার মুখ দেখাবার জায়গা আর কোথাও নেই। এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৃন্ময় থামিল এবং কেমন এক প্রকার অদ্ভুতভাবে হাসিতে লাগিল। তার এই হাসির ধরণে লিলির চোখে জল দেখা দিল এবং তাহাই গোপন করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃন্ময় কহিল, যেও না লিলি, বসো। তুমি অমন চুপ করে থেকো না—তোমার নীরবতা আমার কাছে আরও বেদনাদায়ক। আমরা দু'জনেই ঠকেছি, কিন্তু ঠকেছি আমরা যার যার নিজের দোষে।...

কিছুক্ষণ লিলির আনত মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া মৃন্ময় অন্য প্রসঙ্গে আসিল, আমায় একটা সত্য কথা বলবে লিলি?

লিলি কহিল, বলব নিশ্চয়ই।

সুনির্ম্মলের কথা মনে হলে তুমি ব্যথা পাও লিলি? মৃন্ময় তেমনি বিচিত্র ধরণে পুনরায় ঈষৎ হাসিল, কহিল, আমার জানতে বড় ইচ্ছে হয়। একটুও গোপন করো না।

লিলি একটু ঘুরাইয়া প্রশ্নের জবাব দিল, পাই বই কি। কিন্তু আমার আর আপনার ত এক সমস্যা নয় মিনুদা! লিলি মুহূর্ত্তকাল থামিয়া পুনরায় কহিল, যে অবস্থায় পড়ে আমাকে এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে তা ভোলা কি এতই সহজ যে, সুনির্ম্মলকে আমার আদৌ মনে পড়বে না! কিন্তু এর জন্যে আমি মনে মনে নিজেকেই তিরস্কার করি। সুনির্ম্মল নিন্দা-ভৎ'সনার অযোগ্য—করুণার পাত্র।

মৃন্ময় পুনরায় হাসিল। তেমনি বিচিত্র হাসি। এ হাসি চোখে পড়িলেই লিলির বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠে।...খবর পাইয়া বুরাজাবার

ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রথমেই প্রশ্ন করিল, আপনার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?

মৃন্ময় ম্লান হাসিয়া কহিল, বড্ড খারাপ হয়ে গেছে বুঝি! তা হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

ছেলেটি কহিল, তা হোক, ও দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। এবার তা হলে এখানে থেকে যাচ্ছেন নিশ্চয়।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, তাই ভেবেই ত এলাম। আপনার আকর্ষণই যেন আমায় চুম্বকের মত টেনে এনেছে। আপনি বাড়ীতে থাকবেন ত এখন?

ছেলেটি একগাল হাসিয়া কহিল, বলেন ত থেকে যেতে পারি। আপনার কোন দরকার আছে বুঝি।···না হয় আমিই আবার আসব।

মৃন্ময় একটু দ্বিধাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, না না তার কিছু দরকার নেই। আমি এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

ছেলেটি চলিয়া গেল, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে জানাইয়া গেল যে সম্ভব হইলে সে পুনরায় ওবেলায় আসিবে, এবং বৈকালের বহু পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইল। হাসি মুখে কহিল, বাবার হুকুম তাই আসতে হ'ল। একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল, বাবা তাঁর লাইব্রেরি দেখবার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর পাঠাগারের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝি না। ঐ রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে দিনরাত ডুবে না থাকলে যেন পাঠাগারকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো হয় না।

মৃন্ময় কহিল, আপনার বাবা বুঝি খুব পড়াশুনা করতে ভালবাসেন?

ছেলেটি কহিল, একেবারে সাংঘাতিক ভালবাসা যাকে বলে। দিনের অর্দ্ধেক সময় তিনি ওখানেই কাটিয়ে দেন। নাওয়া খাওয়ার খেয়াল পর্য্যন্ত তাঁর থাকে না। আচ্ছা আপনিই বলুন ত দিন রাত ঐ কাগজের স্তূপের মধ্যে ডুবে থেকে মানুষ কি আনন্দ পায়?

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, আপনার বাবা ত ওতে ডুবে থাকতেই আনন্দ পান আপনি বলছিলেন।

ছেলেটি একটু লজ্জা পাইল, কহিল, বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর এই খেয়ালের মানে আমি বুঝতে পারি নে।

লিলি হঠাৎ আসিয়া পড়ায় তাহাদের কথার মাঝখানে ছেদ পড়িল। স্মিতমুখে লিলি কহিল, চা নিয়ে আসব তোমাদের জন্যে?

ছেলেটি বাধা দিয়া কহিল, চা আজ থাক। বাবা মৃন্ময়বাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছেন।

লিলি চলিয়া গেল।

ছেলেটি মৃন্ময়কে তাগিদ দিল। কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা দু'জনে বাহির হইয়া পড়িল। কথায় কথায় তাহারা অনেকটা দেরি করিয়া ফেলিয়াছে।

২৪

রাজাবাবু মৃন্ময়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, তিনি তখন তাঁর পাঠাগারেই ছিলেন। মৃন্ময় বারকয়েক বাহির হইতে ভিতরে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া শেষে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

মৃন্ময় কেমন যেন অভিভূতের মত নিজের অজ্ঞাতেই এ কাজ করিল। ইহাকে পাঠাগার না বলিয়া পবিত্র দেবমন্দির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঘরে কত জ্ঞানীগুণী মনীষীর চিন্তাধারা যেন স্তব্ধ হইয়া আছে। তাঁদের ভাবনা, তাঁদের মনের ঐশ্বর্য্য, আনন্দ-বেদনা, সুদীর্ঘ-

কালের সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল—এই ঘরের আবহাওয়ার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আছে। এখানে বসিয়া চরম সত্যের উপলব্ধি করা যায়, মানুষের মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া চলে। যাহা ভাবিয়া দেখা হয় নাই, এক সময় যাহা মনের মধ্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নাই, অসম্ভব, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এখানে বসিয়া নীরবে চিন্তা করিলে তাহাই সুন্দর এবং সত্যরূপে মনকে আকৃষ্ট করে। এখানে হিংসাবিদ্বেষের নীচতা নাই, যুগযুগান্তের দেশবিদেশের মনীষীরা এই অনতিবৃহৎ কক্ষে যেন অমর হইয়া পাশাপাশি বিরাজ করিতেছেন। পুস্তকস্তূপের অন্তরালে এই পাঠাগারের যে রূপ মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় তা বিচিত্র। কখনও তাহা বাল্মীকির চোখের জলে করুণ, কখনও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার রশ্মিচ্ছটায় প্রদীপ্ত, কখনও বায়রণের ভোগবিলাসের বর্ণনায় মুখর, কখনও টলস্টয়ের উদার আদর্শবাদের মহিমামণ্ডিত। মানুষের মন যে ভাবে ইহাকে চায় সেই ভাবেই পাইতে পারে।

মৃন্ময়ের হঠাৎ মনে হইল যে, এমনি একখানি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গভীর চিন্তাধারার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে বেশ হয়। দৈনন্দিন সঙ্গী হিসাবে ইহার শ্রেষ্ঠত্বে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রাজাবাবু মৃন্ময়ের এই তন্ময়তায় মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেন। এত বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন তার পাঠাগারকে আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। ইতিপূর্ব্বে যাঁরা আসিয়াছেন তাঁরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন পুস্তকাধারগুলির অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে, বিস্মিত হইয়াছেন অজস্র পুস্তকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া। পুলকিত চিত্তে বাহবা দিয়াছেন তাঁর অর্থব্যয়ের বহর দেখিয়া। সকলেই রাজাবাবুর অর্থব্যয়ের দিকটায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাঁর মনের গভীর যোগ রহিয়াছে সে স্থানটা কারুর দৃষ্টিতে পড়ে নাই।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, টাকা অনেকেরই আছে। খরচও সকলেই করে থাকেন। কিন্তু আপনার অর্থব্যয় সার্থক রাজাবাবু।

রাজাবাবু খুশীর সুরে কহিলেন, বড় আনন্দ দিলেন আজ আপনি। আপনার চোখে যে প্রকৃত সত্য ধরা পড়েছে এতে আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি সে আপনি বুঝবেন না মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

রাজাবাবু কহিলেন, বিলক্ষণ—

মৃন্ময় কহিল, আপনার এ পাঠাগার কি সাধারণের জন্য খোলা থাকে, না নিতান্তই এ আপনার ব্যক্তিগত।

রাজাবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনি কি বলতে চান তা আমি বুঝেছি। দেখুন আমাদের দেশ এখনও এ জিনিষটির পুরো মর্য্যাদা দিতে শেখে নি। তাই যা কল্পনা করি বাস্তবে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভয় হয় পাছে কেউ অনাদর করে। কিন্তু যে যথার্থ অনুরাগী তার জন্য আমার পাঠাগারের দ্বার সব সময় খোলা থাকে। সাধনার মূল্য যাঁরা দিতে জানেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি

রাজাবাবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মৃন্ময়কে গ্রন্থাগারটি দেখাইতে লাগিলেন। এইটেতে ফরাসী সাহিত্য, এইটেতে রাশিয়ান, এখানে পাবেন ইংরাজী, এপাশে আছে জাপানী সাহিত্য আর এই দেখুন সংস্কৃত সাহিত্যের বহু পুরাতন গ্রন্থ ও কাব্য। আমাদের বাংলা সাহিত্যও তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এঁরা যে-কোন দেশের গৌরব।

রাজাবাবু একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই আমি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। এর পিছনে বহু অর্থব্যয় আমাকে করতে হয়েছে। অনেকে বলেন এ আমার এক ধরণের বিলাস। শুধু আপনার বেলায়ই দেখলাম তার ব্যতিক্রম।

রাজাবাবু থামিলেন। কয়েক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, আপনার বয়স কম। আমার মহীপালের চেয়ে সামান্য বড় হবেন হয়তো, কিন্তু তবুও আপনি শ্রদ্ধার পাত্র।

মৃন্ময় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। আর মহীপাল তার স্বল্পভাষী পিতার মুখে অনর্গল এত কথা ইতিপূর্ব্বে আর শুনিয়াছে কিনা মনে মনে তাহারই হিসাব করিতেছিল।

মৃন্ময় লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, কত অল্প আমরা জানি, আর জানবার যে কত আমাদের বাকী আছে তা এমন করে এর আগে টের পাই নি।

রাজাবাবু নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, প্রশ্নটা অসঙ্গত হলেও কৌতূহল দমন করতে পারছি না। যতগুলো ভাষার বই এখানে রয়েছে এর সব কয়টিই কি আপনার জানা ?

রাজাবাবু তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলেন, সব ভাষা জানা না থাকলেও তেমন ক্ষতি হয় না। তবে মূল গ্রন্থের রসাস্বাদন কিছুটা ব্যাহত হয় মাত্র।

তিনি প্রশ্নের জবাবটা এড়াইয়া গেলেন। মৃন্ময় বুঝিয়াই নীরব রহিল। কিন্তু জবাব দিল মহীপাল, বাবার প্রায় সব কয়টি ভাষাই জানা আছে।

রাজাবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, অল্প-স্বল্প জানা আছে। করবার মত হাতে কিছু না থাকলে ঐ নিয়েই নাড়াচাড়া করি।

মৃন্ময় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

২৫

সূর্য্য ওঠে অস্ত যায়। গতি তার নিয়মে বাঁধা। দিন এক আসে আর যায়। দিনের সমষ্টিতে মাস। মাসের সমষ্টিতে বৎসর—তাহাও ঘুরিয়া আসে।

মৃন্ময়ের বয়স আরও বছর তিনেক বাড়িয়া গিয়াছে, রাজাবাবুর পাঠাগারেই তার বেশীর ভাগ সময় কাটে। ও যেন আর আগের মানুষ নাই। অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, যেটা এই বয়সের পক্ষে নিতান্ত বেমানান। কথা সে হিসাব করিয়া বলে। যেন বলিতে না হইলেই বাঁচিয়া যায়।

লিলি অনুযোগ দিতে চায়, কিন্তু কোথা হইতে একটা সঙ্কোচ আসিয়া তার কণ্ঠরোধ করে। লিলি এখন মা। সুনির্ম্মলের ছেলের গর্ভ-ধারিণী। বছর তিনেক প্রায় বয়স হইয়াছে ছেলেটির। এটি সুনির্ম্মলের স্মৃতি। ভাবিতে গিয়া মন তিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু নিরপরাধ শিশুর প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিতেই তার মন এক অনির্ব্বচনীয় মধুর রসে সিক্ত হইয়া যায়; শিশুকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে। মুখে হাসি দেখা দেয়। মায়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া আধো আধো স্বরে শিশু ডাকে—মা—

মৃন্ময় কতদিন চাহিয়া চাহিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিয়াছে। বুক তার ভরিয়া উঠিয়াছে। অথচ ঐ ছোট্ট শিশুকে কিছুতেই সে সহজ ভাবে

গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না যে, উহাকেই কেন্দ্র করিয়া তার জীবনে এত বড় বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে।

অবোধ শিশু—মৃন্ময়ের কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইবার সাহস রাখ তুমি! আবার কচি দুখানা হাত বাড়াইয়া কোলে আসিতেও চাও! মৃন্ময় করুণ দৃষ্টিতে শিশুর পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া নিজের হাত দুখানা বাড়াইয়া দেয়। শিশু তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ওর নিষ্কলঙ্ক সারল্যকে সে কেমন করিয়া বার বার উপেক্ষা করিবে। কিন্তু যুক্তি ও আচরণের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য থাকিয়া যায়। মৃন্ময় সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইতে পারে না এবং এই না পারার জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়, অন্তরে বেদনা অনুভব করে। কিন্তু মৃন্ময় তখনও টের পায় নাই যে, নিজেরই অজ্ঞাতে ঐ শিশুর প্রতি অন্তরে অন্তরে তার কতখানি স্নেহ জমিয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ের আজ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। এখনও সে পাঠাগারে যায় নাই। ইহা তার এই চার বছরের জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লিলি আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, এ জায়গাটা তোমার বোধ হয় সহ্য হচ্ছে না মিনুদা?

মৃন্ময় তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন লিলি। আমি ত বেশ ভালই আছি। তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমার তো কোন দিকেই তেমন খেয়াল থাকে না।

লিলি একটু চমকাইয়া উঠিল। অনুযোগ দিয়া কহিল, তুমি আমায় কি ভাব মিনুদা! তা ছাড়া তোমার জন্য আমার কতটুকুই বা করতে হয়। তোমার জন্যই এ কথা আমায় বলতে হচ্ছে। দিন দিন তোমার চেহারা যে কি হয়ে যাচ্ছে তা তুমি না দেখলেও আমার তো চোখ এড়ায় না।

একটু থামিয়া শান্ত কণ্ঠে পুনরায় লিলি কহিল, এমন করে নিজের ক্ষত করবার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমায় দিন কয়েকের জন্য অন্য কোথাও গিয়ে হাওয়া বদল করে আসতে হবে।

মৃন্ময় তেমনি হাসি মুখে কহিল, এ সব তোমার বাড়িয়ে বলা। এখানে আমি বেশ আছি। আর শরীরও আমার খুব ভালই আছে।

লিলি কহিল, তা হলে পরিষ্কার ভাবেই বলছি। মোট কথা এখানে থাকতে হলে তোমায় নিয়ম মেনে চলতে হবে।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া প্রতিবাদ করিল, তোমার অনিয়মটাই যে আজ আমার কাছে নিয়ম হয়ে উঠেছে লিলি।

লিলি একটু উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, তোমার যুক্তি আমি শুনতে চাই না মিনুদা। দিনের পর দিন আমার চোখের সামনেই নিজের এতবড় সর্ব্বনাশ তুমি করবে সে আমি হতে দেব না।

মৃন্ময় ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিল—তুমি পাগল লিলি··· তুমি পাগল···

সহসা লিলির দু' চোখ সজল হইয়া উঠিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার দিকে চাইলেই নিজেকে আমার সব চেয়ে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। আমায় এ কথা ভাববার অবকাশ দিও না মিনুদা। নিজের কাছে নিজে বড় ছোট হয়ে যাই।···একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, তুমি আমায় এড়িয়ে চলো—কিন্তু সংসারে আর আমারও কেউ নেই যে!

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, তুমি অত বোকা হয়ো না লিলি। অযথা ভুল বুঝে নিজেও দুঃখ পাবে, আমাকেও দেবে।

লিলি কহিল, আমায় তুমি ক্ষমা করো। কিন্তু কিছুতেই এ সব কথা আমি ভুলতে পারছি না। এগুলো দিনরাত আমার মনের উপর বোঝার মত চেপে বসে আছে।

মৃন্ময় পুনরায় বলিল তুমি পাগল লিলি।…

লিলি আর কথা বাড়ায় না। ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।…

দিন চলিতে থাকে। লিলির ছেলেকে মৃন্ময় ইদানীং অনেকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছে। অবোধ শিশু যখন কাঙালের মত ভয়ে ভয়ে তার পানে চোখ তুলিয়া তাকায় মৃন্ময়ের বুকের সবচেয়ে কোমল স্থানটি তখন যেন ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠে। মানুষের বুকের চিরন্তন স্নেহ-বুভুক্ষা তার অন্তরের অন্তস্তলে জাগিয়া উঠে।

বাঙলো-সংলগ্ন ছোট লনে ইদানীং মৃন্ময়কে প্রায় প্রত্যহই লিলির ছেলেকে লইয়া খেলা করিতে দেখা যায়। শিশুর মত উল্লাসে মৃন্ময় অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, হুয়ো হেরে গেলে তুমি। পঙ্কজবাবু হেরে গেছ।

শিশু পঙ্কজ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। মৃন্ময়কে অনুকরণ করিতে গিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে এমন এক ভাষার সৃষ্টি করে যে মৃন্ময় পর্য্যন্ত না হাসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এই হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পঙ্কজ দ্বিগুণ উৎসাহে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে।

মৃন্ময় বলে এদিকে বলটা ছুঁড়ে দাও পঙ্কজবাবু।

পঙ্কজ প্রাণপণ শক্তিতে বলটি ছুঁড়িয়া দেয় সম্মুখের দিকে না যাইয়া বলটি পিছনের দিকে চলিয়া যায়।

মৃন্ময় বলে, এলো না পঙ্কজ। আবার মারো।

পঙ্কজের উৎসাহ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত সে কৃতকার্য্য হয়।

রাজাবাবুর ছেলে উপঢৌকন পাঠাইয়াছে—একজোড়া খরগোস! খবরটা লিলি দিতেই পঙ্কজ মায়ের অনুসরণ করিল এবং অনতিকাল মধ্যেই একটা খরগোসের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে মৃন্ময়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। খুশীর সুরে কহিল, খরগোস।

মৃন্ময় কহিল, হ্যাঁ খরগোস।

কিন্তু এর পরেও যে পঙ্কজ বহুক্ষণ ধরিয়া তার নিজস্ব ভাষায় কি বকিয়া গেল তাহার এক বর্ণও মৃন্ময়ের কানে গেল না। মন তার তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ছেলেবেলার একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা যে আজ আবার এমনি করিয়া মনে পড়িবে তা কে জানিত। সংসার-অনভিজ্ঞ দুটি বালক-বালিকা তখন তারা—মৃন্ময় আর মঞ্জুষা। তার পরে কতদিন চলিয়া গেল, কত ঘটনার সূচনা এবং সমাপ্তি ঘটিল, কিন্তু অতীতের অতি তুচ্ছ একটি ঘটনা আজও যেন জীবন্ত হইয়া তার চেতনার সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আজ তার অস্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

পঙ্কজ বকিয়া বকিয়া সমর্থনের অভাবে কখন যে চলিয়া গিয়াছে মৃন্ময়ের হুঁস নাই। কখন যে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে তাহাও সে জানে না। তার চোখের সুমুখ হইতে বর্ত্তমান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। বিক্ষুব্ধ মৃন্ময় তাঁর বাল্য জীবনের প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। মঞ্জুষার মৃদু গুঞ্জন যেন তার কানের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময় ভোলে নাই—ভুলিতে সে পারে না। চৈতন্যের সঙ্গে বড় নিবিড় সম্বন্ধ তার।

লিলি আসিয়া মৃন্ময়ের কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, বাইরে হিম পড়ছে, ভেতরে চলো মিনুদা। সন্ধ্যা বহুক্ষণ হয়ে গেছে। শরীরটা কি তেমন ভাল ঠেকছে না?

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, খেয়াল ছিল না। চল যাই। চলিতে চলিতে মৃন্ময় পুনরায় কহিল, রাজাবাবুর ছেলে বুঝি খরগোস দুটো পাঠিয়ে দিলে? পঙ্কজ খুব খুশী হয়েছে বুঝি?

লিলি সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ সেই থেকেই ঐ দুটো নিয়ে আছে।

মৃন্ময় কহিল, ছেলেমানুষ কিনা অল্পেতেই খুশী। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় কহিল, মঞ্জুষার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেও এমনি

দুটো খরগোসকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কত মুখ ভার করা…কথা বন্ধ… শেষ পর্যন্ত ঝগড়াটা মিটে অবশ্য গিয়েছিল, কিন্তু সে দিনের সে তুচ্ছ ঘটনাগুলোই আজ আমার জীবনে একটা বড় রকমের ঝড় তুলেছে। মনের ভিৎ পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে।

লিলি সবই বোঝে কিন্তু কথা বাড়াইতে চাহে না। নীরবে চলিতে থাকে।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, জীবনে খুব বড় আশা ছিল, একটা মস্ত আত্মাভিমানও ছিল। তাই হয়তো সব দিক দিয়ে এত বড়…

অকস্মাৎ থামিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কহিল, আজকাল বড্ড বাজে বকি। কথাটা আমায় স্মরণ করিয়ে দাও না কেন লিলি।

লিলি কহিল, এবার থেকে দেব।

মৃন্ময় কহিল, তাই দিও লিলি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার গোটাকয়েক কথা ছিল।

লিলি কহিল, ঘরে গিয়ে বললে কি তোমার কোন অসুবিধা হবে? না হয় খেতে বসেই বলো।

মৃন্ময় কহিল, তাই না হয় বলব। কিন্তু কি জান, জীবনটার বড় অপচয় করেছি আমি। হয়ত নিজের অপূরণীয় ক্ষতি করেছি।

লিলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, ভাল করো নি মিনুদা।…

মৃন্ময় কহিল, তা করি নি হয় তো। একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, দিন কয়েকের জন্য আমি অন্য কোথাও যাব ভাবছি।

লিলি মৃন্ময়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিল, কোন জবাব দিল না।

মৃন্ময় অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল, কহিল, তোমাকে কোন দিন আমার নাকুদার গল্প করেছি লিলি? আমাদের ক্লাশের ডাকসাইটে মনিটার নাকু—

একবার নয় বহুবার। কিন্তু আর একবার শোনাবার ইচ্ছে যদি থাকে তবে সে অন্য সময়। ভেতরে চলো।

পঙ্কজ তখনও খরগোস দুইটা লইয়া মাতিয়া রহিয়াছে। লিলি তাহাকে ধমক দিতেই নিতান্ত অপরাধীর মত জড়সড় ভাবে ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিল, কহিল, এখন ঘুমাও পঙ্কজ। কাল সকালে উঠে আবার খেলা করো। পঙ্কজ কেমন এক প্রকার দুষ্ট লাজুক হাসি হাসিয়া বাধ্য ছেলের মত শুইয়া পড়িল।

মৃন্ময়কে আজ যেন কথায় পাইয়াছে। আহারে বসিয়াও সে পূর্ব্ব-কথার জের টানিয়া বলিল, নান্টু এক সময় আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তখন আমরা নিতান্ত ছেলেমানুষ, সেই সময় থেকেই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা।

লিলি মৃদুকণ্ঠে কহিল, শুনেছি—তারপর···

মৃন্ময় কহিল, এখানে আসা অবধি পরস্পরের খবর আমরা রাখি নি। আমি রাখি নে ইচ্ছে করে, আর সে রাখে নি বাধ্য হয়ে। কিন্তু দিন কয়েক ধরেই দেখছি নানা ভাবে সে আমার খোঁজ নিচ্ছে। মনটা বড় দুর্ব্বল। কত আজগুবি চিন্তা এসে মনকে নাড়া দেয়। কল্পনায় কত স্বপ্ন দেখি !

লিলি নীরব।

মৃন্ময় বলিয়া চলিয়াছে, যার বেঁচে উঠার কোন আশা নেই সেও যেমন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে আমারও হয়েছে তাই।

লিলি কহিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে তোমার সব কথা শুনব মিনুদা। সারা দিন বড় খাটুনি গেছে। বড় ক্লান্ত আমি। তুমি আমায় মাপ কর।

মৃন্ময় একটু বিস্মিত ভাবেই লক্ষ্য করিল লিলির সারা মুখে কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিয়াছে। মুখে তাহার লেশমাত্র কোমলতা নাই। কিছুক্ষণ বোকার মত তার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মৃন্ময় কহিল, তোমাকে কোন রূঢ় কথা বলেছি কি আমি? তোমার মুখ অত শুকনো কেন? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো? মৃন্ময় এক সঙ্গে বহু প্রশ্ন করিল এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

লিলি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ও কিছু নয় মিনুদা। বুকে হঠাৎ একটা ব্যথা বোধ করেছি, তাই। কিন্তু তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! খাও।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও মৃন্ময়ের কাটে নাই। সে কহিল, বুকের ব্যথা তা আমায় এতক্ষণ বল নি কেন? আমি এখুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি। তুমি দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ লিলি।

লিলি যে দিন দিন কি হইয়া যাইতেছে তাহা সে ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিয়া লাভ কি। সে চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে, তাই নীরবই আছে।

মৃন্ময় ততক্ষণে উঠিয়া পড়িয়াছে। লিলি বাধা দিতে গিয়াও পারিল না। মৃন্ময় তার জন্য ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে। তার কথা সে ভাবে। কিন্তু ও চলিয়া যাইবার জন্য অমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন? নিজের অজ্ঞাতে লিলির একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

২৬

কথাটা এমন কিছুই নয়।…

মৃন্ময় এখানে চিরদিন কাটাইবে এমন কিছু দাসখৎ লিখিয়া দেয় নাই, কিন্তু তার এখানে অবস্থিতিটাই যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই অকস্মাৎ মৃন্ময়ের চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে লিলি চমকিত হইল। চলিয়া যাইবেই এমন কথা খোলাখুলি এখনও মৃন্ময় বলে নাই বটে, কিন্তু তার একান্ত মনের কথাটি লিলির জানিতে ত বাকী নাই। অবশ্য একথা মনে হইতে পারে লিলির যে, এই ব্যাপার লইয়া অতটা উতলা হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু লিলি হঠাৎ যেন নিজেকে আবিষ্কার করিল। দীর্ঘ চারি বৎসরের সাহচর্য্যের ভিতর দিয়া—স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার অন্তরালে অন্য যে বস্তুটি লিলির অন্তরে লোকচক্ষুর অগোচরে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কোন সন্ধানই সে এতদিন পায় নাই। তাই নিজের সম্বন্ধে হঠাৎ যখন তার সত্যোপলব্ধি হইল তখন সে অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মৃন্ময়ের কাছে তার কিছুই কাম্য নাই। শুধু চোখের সম্মুখে তাকে ধরিয়া রাখা। স্নেহে ও মৌন সেবায় তার শ্রীহীন জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা।

মৃন্ময় কহিল, সেই থেকেই ভাবছি যে, একবার নান্কুর সঙ্গে দেখা করব কিনা! কি জানি হয়তো আমার জন্য আরও কোন গভীর বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। হয়তো…

মৃন্ময় থামিল। কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিবার পর যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল তখন লিলির মনে হইল সে মুখে যেন রক্তের লেশমাত্রও নাই। লিলি ভয় পাইয়া গেল। দৃঢ় মুষ্টিতে মৃন্ময়ের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে শুধু বার বার বলিতে লাগিল, কি হয়েছে মিনুদা—তোমার হ'ল কি !

মৃন্ময় এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, একটা অসম্ভব কথা মনে হয়েছিল তাই···মৃন্ময় পুনরায় হাসিল। এ হাসির রূপ আলাদা। লিলি ইহাতে ভয় পায়, মৃন্ময়কে আর বেশী কথা বাড়াইতে দিতে চায় না। মৃন্ময়ের কথাটা সে কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছে। এবং হয়তো পাছে নূতন করিয়া আঘাত পায় এই আশঙ্কায় লিলি নিজের হৃদয়াবেগকে চাপিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যেন মুখে মৃন্ময়ের মনের কথাটারই প্রতিধ্বনি করিল। কহিল, যাবে বৈ কি মিনুদা। নিশ্চয় যাবে। আমার মন বলছে নান্টুবাবুর এই খোঁজ নেওয়ার পিছনে কোনো নিগূঢ় কারণ আছে।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। তুমি হয়তো আমার মনের কথাটাই প্রকাশ করেছ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বুঝি মরে গেছে।

লিলি বড় করুণ একটুখানি হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তা হতে পারে। কিন্তু তবুও যে মানুষ দুঃখবেদনায় মুষড়ে পড়ে সেও আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মরা গাঙেও জোয়ার আসে মিনুদা।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে লিলির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কহিল, হয়তো তোমার কথাই সত্য লিলি। নইলে মনের মাঝে একটা নূতন আগ্রহ আজ জেগে উঠেছে কেন ?

মৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটাও মনে হয় যে, ভুল করে মঞ্জু দুঃখ পেতে পারে—তার দুঃখটাকে আমি খাটো করে দেখছি না। কিন্তু ডাকবার প্রয়োজনই যদি হয়েছিল, মঞ্জু নিজেও তো সে কাজ করতে পারত।

বাধা দিয়া গভীর স্বরে লিলি কহিল, তা সবসময় হয় না মিনুদা। মানুষের মনের কাছে প্রয়োজনের মূল্য কিছুই নয়। তুমি নিজে কেন মঞ্জুর ভুল ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা করো নি? যা সত্য সেকথা তাকে বুঝবার সুযোগ দাও নি কেন? তুমি নিজে যা পার নি, তা অপরের কাছ থেকে আশা করো কোন্ হিসেবে।

মৃন্ময় বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, তাকে আমি কাছে পেলাম কোথায়।

লিলি কহিল, তাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা কোন দিন করেছ কি?

মৃন্ময় কহিল, তা করি নি...।

লিলি কহিল, কেন করনি? আমার বিশ্বাস তুমি একটু চেষ্টা করলেই তার সন্ধান পেতে।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, হয়তো পেতাম। কিন্তু তারপর···

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিয়া চলিল, তার পরের যা অতি অল্পেই তার পরিসমাপ্তি হ'ত। চারদিক দিয়ে এমনি করে জট পাকিয়ে উঠত না। কিন্তু তা তুমি পার নি। তোমার মধ্যে অভিমানটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, অথচ এই অভিমান যে তার মনেও সমানভাবে জাগতে পারে এ কথাটা একবারও তুমি তলিয়ে দেখনি। একবার···

মৃন্ময় এতক্ষণ নতমুখে শুনিতেছিল, সহসা বাধা দিয়া কহিল, তুমি হয়তো অনেক বোঝ, বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে তোমার বোঝাটা ভুল না হওয়ারই কথা। কিন্তু আমিও তো সংসারে চোখ বুজে চলি না লিলি।

লিলি কহিল, তোমাদের ঐ দম্ভই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।

মৃন্ময় লিলির এই উক্তির প্রতিবাদ করিল না। সে তার পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া বলিয়া চলিল, অভিমান করে দু' দিন কথা বন্ধ করে থাকা চলে, সাময়িক ঝগড়াঝাঁটিও হতে পারে, কিন্তু এ তা নয় লিলি। এর পেছনে রয়েছে নিদারুণ ঘৃণা। নইলে মঞ্জু আমার জন্য অপেক্ষা করত, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন বোধ করত এবং কান্নাকাটি করে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই একটা মীমাংসা করে নিত। ওকে জানবার সুযোগ তোমার হয় নি, তাই এ কথা তুমি বলতে পারছ লিলি।

লিলি শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, তা হলেও আমি এই কথাই বলতাম মিনুদা। সে যে মেয়ে এবং এই বাংলাদেশেরই মেয়ে! কিন্তু মঞ্জু সত্যিই কৃপার পাত্রী। আমার চেয়েও অদৃষ্ট তার মন্দ।

লিলি থামিল।

কাছাকাছি কোথাও মাদল বাজিয়া উঠিয়াছে। সম্ভবত পাহাড়ীদের নৃত্য সুরু হইয়াছে। কাছেই সাঁওতাল পল্লী। ওরা আছে বেশ। ওদের সুখ-দুঃখের মানদণ্ড আলাদা।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিবার পর লিলি পুনরায় কহিয়া উঠিল, একের ভুল যে অপরের জীবনে কত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে সে তো অহরহই দেখতে পাচ্ছি।

মৃন্ময় হয়তো তাহাদের কথার মোড় ফিরাইবার জন্যই অন্য প্রসঙ্গ টানিয়া আনিল, আমি এখান থেকে চলে গেলে তুমি দুঃখ পাবে সে আমি জানি। আমার কথা আলাদা, নইলে এই চার বছর ধরে তুমি আমার জন্য যা করেছ সেটা ভুলবার নয়। নিজের মায়ের পেটের বোনও বোধ হয়, তার দাদার জন্য এর চেয়ে বেশী করতে পারত না।

লিলির মুখ শুকাইয়া উঠিতেছিল। সে মৃদু কণ্ঠে কহিল, কতকগুলো বাজে কথা তুলে তুমি কি আমায় সাজা দিতে চাও মিনুদা? তোমার যত বড় ক্ষতি আমার দ্বারা হয়েছে তার জন্য আমি দায়ী হলেও, আমি যে অপরাধী নয় এ কথা তুমি নিজেও জান, তবু কেন যে এ সব কথা তুলে আমায় ব্যথা দিচ্ছ বলতে পারি নে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কোন প্রতিবাদ করিল না।

মানুষ মানুষের মনের ভিতরটা দেখিতে পায় না, তাই এত ভুল বোঝাবুঝি। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে—অবিরাম নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে।

লিলি ভাবিতেছিল, মানুষের যদি এই অন্তর্দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে কেমন হইত? ভুল করা কিংবা ভুল বোঝা সংসার হইতে উঠিয়া যাইত কি? কিন্তু তাহা হইলে জীবনে বৈচিত্র্য দেখা দিত কোন্ পথে? একটা দম দেওয়া ঘড়ি আর মানুষে কতটুকু তফাৎ থাকিত।

মৃন্ময় লিলির চিন্তাকুল মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া শেষে কহিল, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ। তোমায় ব্যথা দেবার ইচ্ছে নিয়ে ওকথা আমি বলি নি লিলি।

লিলি ক্ষণকালের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ করিল।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, মেয়েরা প্রয়োজন হলে যে সব অবস্থার সঙ্গেই নিজেদের মানিয়ে চলতে পারে সেটা তোমার দেখলে যেমন করে বুঝতে পারি আর কিছুতেই তেমন নয়।

লিলি তথাপি নীরব।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, আমার জীবনের পথে তোমার আবির্ভাব কতকটা দুষ্টগ্রহের মত একথা তুমিই আমায় বলেছ; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটাও

ভাবতে পার না কেন যে, আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হবে বলেই তোমার আবির্ভাব। আমাকে বিশ্বাস করো লিলি।

লিলি চুপ করিয়া শুনিতেছিল।

মৃন্ময় তেমনি ভাবেই বলিয়া চলিল, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কেন তুমি আমার সব কথা সহজভাবে নিতে পার না। আমার আচরণে কোথাও কি কোন ত্রুটি আছে লিলি? অবশ্য একথা ঠিক যে, নানা কারণে তোমার সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু তা মাত্র ততদিন পর্য্যন্ত যত দিন তোমার সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভুল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজেকে শাসন করেছি।

লিলি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। অথচ জোর করিয়া মৃন্ময়কে সে থামাইয়া দিতেও পারিতেছিল না।

মৃন্ময় আপন খেয়ালে বলিয়া চলিয়াছে, লোকে আমার কথা শুনলে পাগল বলবে। কিন্তু তারা শুধু উপহাস করতেই জানে। তা বলে তুমি আমায় ভুল বুঝো না। সে হবে আমার কাছে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক।

লিলির এসব আলোচনা আর ভাল লাগিতেছিল না। সে ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। কহিল, রাত অনেক হ'ল।

'সে আমি জানি' মৃন্ময় কহিল, 'কিন্তু জোর করে আমার মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করো না লিলি। হয়তো জীবনে এমন সময় এবং সুযোগ আর নাও আসতে পারে।'

'আঃ!' লিলি মুখে একপ্রকার বিরক্তিসূচক শব্দ করিল। কহিল, তুমি কি কিছুতেই থামবে না? না আমায় এসব কথা শোনাবার জন্যে তুমি একেবারে কোমর বেঁধে এসেছ! তুমি কি চিরদিনের জন্যে চলে

যাবার মতলব এঁটেছ? ভাবছ কি তা তুমি পারবে? কক্ষনো না—আমি যে কত বড় অসহায় একথা তোমার চেয়ে বেশী ত আর কেউ জানে না মিনুদা।

মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

লিলি কহিল, তোমার ঐ অদ্ভুত হাসিকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় মিনুদা...

মৃন্ময় ইহারও কোন জবাব দিল না। তেমনি স্মিতমুখেই লিলির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

২৭

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই পাশে পঙ্কজকে না দেখিয়া লিলি শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। বড় দুরন্ত হইয়াছে ছেলেটা। কিন্তু বাহির হইতে যাইয়া পুনরায় সে আড়ালে সরিয়া গেল। মৃন্ময়ের ভাবগতিক দেখিয়া লিলির কেমন ভয় হয়। স্বভাবতঃ গম্ভীর মৃন্ময় হঠাৎ কেমন যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পঙ্কজকে সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—আর দুরন্ত ছেলেটা মৃন্ময়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। কিন্তু মৃন্ময়ের দু' চোখ ছাপাইয়া তখন জল গড়াইয়া পড়িতেছে। মৃন্ময়ের অন্তরের গোপন কথা হয় তো লিলি জানিলও না, কিন্তু সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, উপভোগ করিতেছিল এই দুই অসম-বয়সীর অপূর্ব্ব মিলন।

লিলির এই লুকাইয়া দেখা অকস্মাৎ মৃন্ময়ের চোখে পড়িয়া গেল। সে একটু হাসিয়া কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে কহিল, কি জানি যদি আর কোন দিন দেখা না হয়। প্রাণ ভ'রে ওকে এক দিনও আদর করি নি, তাই!

মৃন্ময়ের রকম দেখিয়া লিলির চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাই গোপন করিতে সে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। নিজের কথা লিলি আর ভাবে না—ভাবিতে চায়ও না সে। বরং এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মৃন্ময়ের জীবনে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ হয় তো আর এ জীবনে হইবে না।

কথাটা ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। রাজাবাবুর বাড়ী হইতে মৃন্ময়ের নিকট আহ্বান আসিল—টি পার্টিতে যোগদান করিতেও হইল। কত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে এ প্রশ্নটা সে এড়াইয়া গেল, কহিল, কত আর দেরী হবে—

ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে সে নিজেও সঠিক কিছু জানে না, আসিবে কিনা তাহাও বলা কঠিন। নাঙ্কু তার খোঁজ করিয়াছে—তাই সে যাইতেছে। ভবিষ্যৎই তার পথ নির্দ্দেশ করিবে।

রাজাবাবু কিন্তু কথাটা অন্য ভাবে গ্রহণ করিলেন, খুশী হইয়া কহিলেন, তা বটে কত দিন আর আপনাকে বাইরে থাকতে হবে। তা ছাড়া আপনার পক্ষে বেশী দিন অন্যত্র থাকা ত সম্ভবও নয়। তিনি হাসিলেন। মৃন্ময়ও সে হাসিতে যোগ দিল।

আজ মৃন্ময় কলিকাতা যাত্রা করিবে। বাংলোর পরিবেশ কেমন যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। লিলি মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা কহিতেছে যাহা মৃন্ময়ের কাছে অর্থহীন। লিলিকে এক নাগাড়ে দশ মিনিট কোথাও দেখা যাইতেছে না। কেমন একটা অস্থিরতা তার প্রতিটি কাজে এবং কথায় প্রকাশ পাইতেছে।

মৃন্ময় তাহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শরীরটা কি তেমন ভাল ঠেকছে না ?

লিলি উত্তর দেয় নাই, কেবল হাসিয়াছে। এ হাসির মধ্যে মৃন্ময় শুধু আসন্ন বিদায়ের সাময়িক বেদনাই প্রচ্ছন্ন দেখিল। ইহা ছাড়া অন্য কোন কথা তার মনে স্থান পায় নাই—সে দৃষ্টি তার নাই। মেয়েদের জটিল মনস্তত্ত্বের কথা ভাবিতে সে অনভ্যস্ত। তেমন সুযোগ তার জীবনে কোন দিন দেখা দেয় নাই। সোজা জিনিষটাকে ঠিক সোজা ভাবেই সে দেখে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তার অনুভূতির কিছুমাত্র অভাব আছে তা নয়। তা ছাড়া এই মুহূর্তে তার নিজের মন এমন বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আছে যে কোন কথা গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিবার ধৈর্য্য তার নাই।

সকাল হইতেই পঙ্কজ মৃন্ময়ের পিছু লইয়াছে। শিশু-মনের রহস্য সে জানে না। হাসিয়া বলে, তোমার জন্য একটা রেলগাড়ী আনব পঙ্কজবাবু!

মৃন্ময় আজ যাইবে এ কথাটা শিশু পঙ্কজ পর্য্যন্ত জানে। সে রেলগাড়ীর জন্য আগ্রহ না দেখাইয়া তার সঙ্গে যাইবার বায়না ধরিল, তোমার সঙ্গে আমি যাব মামা!

মৃন্ময় নিজের কথাই বলিয়া চলিল, আর একটা মস্ত মোটর গাড়ী, একটা সাইকেল···পঙ্কজের ঐ সকল লোভনীয় দ্রব্যের জন্য কোন আগ্রহ নাই। সে সবেগে মাথা নাড়িতে লাগিল এবং আপন মনে সুর করিয়া বলিতে লাগিল, আমি যাব···আমি যাব।

লিলি আসিয়া ধমক দেয়।

মৃন্ময় বলিল, ওকে তুমি মিছিমিছি বক্‌ছ লিলি। ছেলেমানুষ—

মৃন্ময়কে কথাটা শেষ করিতেও লিলি দিল না। কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ চলিয়া গেল।

মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইলেও সেদিকে মনোযোগ দিতে পারিল না, পুনরায় পঙ্কজকে লইয়া মাতিয়া উঠিল।

মৃন্ময় কহিল, তোমার জন্ম কি কি আনতে হবে আমায় লিখে দাও ত পঙ্কজ। হাতী, ঘোড়া, রেলগাড়ী, সাইকেল সব···

এত বড় প্রলোভন। পঙ্কজকে রীতিমত চিন্তিত দেখা গেল।

মৃন্ময় পরম উৎসাহে বলিতে লাগিল, সবগুলো তোমার হবে। হাতী, ঘোড়া, গাড়ী সব ··

পঙ্কজ কহিল, আর ময়ূর···আর পাখী···

মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে সহজ হইয়া উঠিল। পঙ্কজকে সাদরে কাছে টানিয়া তার কচি গালের উপর নিজের মুখ রাখিয়া কহিল, তাও এনে দেব তোমায়।

পঙ্কজ এতক্ষণে ফর্দ্দ করিতে বসিল এবং কতকগুলি সোজা ও বাঁকা রেখার সাহায্যে তাহা সমাপ্ত করিয়া খুশীমনে মৃন্ময়ের হাতে দিল। কহিল, লিখে দিয়েছি।

মৃন্ময় সযত্নে তাহা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

পঙ্কজ গোঁ ছাড়িয়াছে। ছেলেটা যেন মৃন্ময়কে পাইয়া বসিয়াছে। তারও একটা কেমন যেন মায়া পড়িয়া গিয়াছে।

লিলি পুনরায় দেখা দিল।

মৃন্ময় ডাকিল, শোন লিলি।

লিলি দাঁড়াইল। মৃন্ময় একদৃষ্টে তার পানে কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি ভাবছ আমি কিছু বুঝি নি? আসলে তোমরা মেয়েজাত, তোমাদের মন একই ছাঁচে গড়া। কলেজে পড়াশুনো করেই থাক, আর নিজেদের সংস্কারমুক্ত বলে যতই প্রচার করো তোমাদের ভিতরের ইন্‌স্‌টিংট্ যাবে কোথায়? তোমরা কল্যাণী—

লিলির দু’ চোখ সজল হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিল, আমার দুঃখ হয় সুনির্ম্মলের কথা ভেবে। সে আমার চেয়েও দুর্ভাগা। তোমায় চিনলে না।

মৃন্ময়ের কথার ধরণে লিলি কেমন আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অথচ শেষটুকু না শুনিয়াও নড়িতে পারিতেছিল না। এতক্ষণে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু তথাপি সে খুশী হইতে পারিল না, মনটা গভীর বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল কেন? মৃন্ময় যে তার অন্তরের প্রকৃত সত্য জানিতে পারে নাই ইহাতে মন তার বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে কিসের জন্য? এমনি করিয়া সে নিজেকে বহুদিন প্রশ্ন করিয়াছে, উত্তরও সে পাইয়াছে—তবুও প্রশ্নের তাহার বিরাম নাই। এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে যেন তার অনেকখানি আত্মতৃপ্তি লুকাইয়া আছে।...

যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসিল কিন্তু আশ্চর্য্য—লিলির দেখা নাই। লিলি ইচ্ছা করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। কথাটা হয়তো মৃন্ময়ের তেমন ভাবনার উদ্রেক করিত না, কিন্তু বিস্ময় তার সীমা অতিক্রম করিল যখন বিদায়ের মুহূর্ত্তেও লিলি অথবা তার ছেলের দেখা পাওয়া গেল না। পঙ্কজের আয়া আসিয়া জানাইল; মাইজী খোকাবাবুকে লইয়া রাজাবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। কিন্তু এই কি বেড়াইতে বাহির হইবার সময়।

মৃন্ময় নিজের মনকে প্রশ্ন করিল এবং এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া কতকটা যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, আঃ...বোকা মেয়ে...পরমুহূর্ত্তে নিজেকে শাসন করিল, এ ভুল...এ অসম্ভব! লিলি সম্বন্ধে এ চিন্তা মনে আনাও তার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক চিন্তাটা

তার মন হইতে একেবারে দূর হইল না। অন্য পাঁচটা চিন্তার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া রহিল মাত্র।

২৮

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মৃন্ময় পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার একটি বিখ্যাত হোটেলে সে আশ্রয় লইয়াছে।

আবার সেই কোলাহলমুখরিত মহানগরীর জনপ্রবাহ। কিন্তু আজিকার কোলাহল যেন প্রেতলোকের আর্ত্তনাদের মত কানে আসিয়া বাজে। একদিন এখানে সে তার ভবিষ্যৎ গড়িতে আসিয়াছিল। গড়িতে পারে নাই, নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে তার স্বপ্নসৌধ ভাঙিয়া গিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে শহরে কতই না পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

হোটেল হইতে মৃন্ময় বড় একটা বাহির হয় না। ভালও লাগে না। শুধু দিনান্তে একবার করিয়া নান্কুর খোঁজ লইয়া আসে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে কাশী গিয়াছে। যে-কোন দিন আসিয়া পড়িতে পারে।

নান্কু আজকাল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন হইয়াছে। তার মস্ত বাড়ী—গ্যারেজে গাড়ী। মন কৌতূহলাক্রান্ত হইলেও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি তার নাই।

লিলির কথা আজকাল তার সারাক্ষণ মনে পড়ে। তার স্নেহ ও সেবার স্পর্শ যেন মৃন্ময়ের সর্ব্বাঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। হোটেলের রুটিন বাঁধা পারিপাট্যের মধ্যে সে আনন্দ খুঁজিয়া পায় না বরং একটা অভাববোধ

যেন তার বুকের ভিতরে বাসা বাঁধিয়া আছে। ইহার উপর আবার আছে পঙ্কজের স্মৃতি। সে যেন হাসিমুখে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, আমার মোটর···ময়ূর আর রেলগাড়ী···ছেলেটা হুবহু লিলির ছাঁচে গড়া। হয়তো সেইজন্যই সে তাকে এমন ভাবে মায়াডোরে বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছে।

লিলির কাছে মৃন্ময় ঋণী। সে যদি এমনি করিয়া চতুর্দ্দিক দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া না রাখিত, স্নেহে সেবায় তার হৃদয়ের শূন্যতা ঘুচাইবার চেষ্টা না করিত তাহা হইলে হয়তো এতদিনে মৃন্ময় পাগল হইয়া যাইত। মঞ্জুষা আর লিলি। তার জীবনপথের দুই-বাঁকে দু'জনের আবির্ভাব! এরা তার জীবনে আনিয়াছে ব্যথা, আনন্দ দুই-ই।

মৃন্ময় জানে না মঞ্জুষা আজ কোথায় এবং কেমন আছে। তার জীবনের এই ক'টা বছরের মধ্যে অদৃষ্টের কোন্ লীলা চলিয়াছে। আজ যদি মঞ্জুষা আসিয়া তাহার সম্মুখে ত্রুটি স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, 'আমারই ভুল হয়েছিল, তার শাস্তিও আমার যথেষ্ট হয়েছে মিনুদা' তাহা হইলে কি করিবে সে।

হায়রে দুর্ব্বল মানুষ। মৃন্ময় মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল। জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় আবার নূতন করিয়া এ রঙীন স্বপ্ন কেন! কিন্তু এই শাসন মন তো মানিয়া লয় না। বাঁধন একটু আলগা হইতেই বন্যার জলের মত যত রাজ্যের চিন্তা আসিয়া তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এখানে আসিয়া দিন যাপন তার এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওখানে বরং সে ভালই ছিল। কখনও লিলির সহিত গল্প-গাছা করিয়া, কখনও পঙ্কজের সহিত খেলা-ধূলায় মাতিয়া, কখনও বা রাজাবাবুর নির্জ্জন পাঠাগারে বইয়ের স্তূপে নিমগ্ন হইয়া দিনগুলি তাহার এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এখানে এই নিরালা প্রকোষ্ঠে বসিয়া

থাকাও যেমন কষ্টকর, বাহিরের কোলাহলও তেমনি বিরক্তিকর। নান্টু যে কবে পর্য্যন্ত ফিরিবে তাহারও স্থিরতা নাই। এদিকে মন তার সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তা-ভাবনার দোলায় আন্দোলিত হইতেছে।

নান্টু সংসারী হইয়াছে। বড়লোক হইয়াছে, অথচ তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা-ভরসা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু ছন্নছাড়া ভবঘুরে নান্টুর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতির আজ বিরাম হইয়াছে। তাই ত মৃন্ময় আজ ভাবিতেছে যে, কোন্ দুর্ব্বার নিয়তি মানুষের অদৃষ্টকে লইয়া ভাঙা-গড়ার খেলা খেলিতেছে। নইলে তার জীবনের প্রবাহই বা আজ এই বাঁকা পথে মোড় ফিরিবে কেন? এম এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোন কলেজে প্রোফেসারি লইয়া ছাত্রদের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠনে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করিবে। কিন্তু নিয়তির বিধান আজ তাহাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে। অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে!

তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার হৃদয়ের গভীর প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিবার অবকাশ পাইল না। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাহা ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। মৃন্ময় নিজের জীবনের ঘটনাগুলি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে আর ভাবে, কি সে হইতে পারিত, আর কি সে হইয়াছে।

বিগত পাঁচ বৎসরের জীবনে বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা যে মৃন্ময়ের স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই তেমন নহে কিন্তু মৃন্ময় সেদিকে দৃষ্টি দেয় নাই। নিজের মনের উপর বহু রকম উপদ্রবই সে করিয়াছে। বাপমায়ের কথা সে জোর করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, নিজেকে প্রিয়জনের সকল সম্পর্ক হইতে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তাহার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। কিন্তু নিজেকে আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত

করিয়া সে যেন কেমন এক ধরণের আনন্দ পাইয়াছে—এও যেন এক প্রকারের সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ বহুকাল পরে পুরাতন পরিচিত স্থানে ফিরিয়া আসিয়া মনটা সত্যই তার আকুল হইয়া পড়িয়াছে। বাপমায়ের সংবাদ জানিতেও সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ঔৎসুক্যের অন্যতম কারণ যে বিশেষ কোনো প্রিয়জনের দর্শনলাভের সম্ভাবনা এ কথাও সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারিল না।

আজ কয়েকদিন ধরিয়া বিকালের দিকে মৃন্ময় বেড়াইতে বাহির হইতেছে। হয় ইডেন গার্ডেনে নতুবা গড়ের মাঠের কোন একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়া সে চুপচাপ বসিয়া থাকে! এবার সুরু হইয়াছে তার জীবনের চমৎকার এক অধ্যায়। নিজের বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনকে এমনি ভাবে রিক্ত করিবার তার কতটুকু অধিকার ছিল! প্রশ্নটা আজ কয়দিন ধরিয়া সে নিজের মনকে করিতেছে।

নান্টু আজও ফিরিয়া আসিল না। মৃন্ময় নিজের ঠিকানা রাখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনো খবর নাই। মৃন্ময়ের উৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। এমনি সময়ে একদিন রাজাবাবুর এক টেলিগ্রাম লিলির ছেলের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিল। সংবাদটা যেমন আকস্মিক তেমনি মর্ম্মান্তিক।

মৃন্ময়ের সমস্ত অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল অথচ এই ছেলেটিরই উপর এক সময় তাহার মন বিরূপ হইয়াছিল।···কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটি তার মন জিতিয়া লইয়াছিল। টেলিগ্রাম পাইবার মুহূর্ত্তেও মৃন্ময়ের বুক-পকেটে ছেলেটির হাতের লেখাটুকু সযত্নে রক্ষিত আছে। মৃন্ময় একবার পকেট হইতে তাহা বাহির করিয়া দেখিল, দেখিল বালকের হাতের গুটিকয়েক সরল ও বক্ররেখা। তাহার দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল।

রাজাবাবু টেলিগ্রামে তাহাকে যথাসম্ভব সত্বর ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লিলি নাকি অত্যন্ত কান্নাকাটি করিতেছে। কিন্তু ওখানে ফিরিয়া যাইতে মৃন্ময়ের আর ইচ্ছা নাই। বিশেষ করিয়া লিলিকে হয়তো আজ তার এড়াইয়া চলাই উচিত। তা ছাড়া ঐ নিরানন্দ পুরীর মধ্যে সে কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে। পঙ্কজের অভাবটা সে যে এখান হইতেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে! এখনও মৃন্ময়ের কানে পঙ্কজের শেষ কথাগুলি রহিয়া রহিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে, আমি যাব···আমি যাব··· কিন্তু সেই যাওয়া যে এই যাওয়া তখন কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল।

দিনকতক আগেই মৃন্ময় তাহার প্রতিশ্রুতিমত খেলনাগুলি কিনিয়া আনিয়াছিল। ঘরের কোণে সেগুলি সাজান আছে। নান্কুর বিলম্ব দেখিয়া সে ঐগুলি পার্শেলে পাঠাইবে মনস্থ করিয়াছিল। কিন্তু সে প্রয়োজনও ফুরাইয়া গেল।

এক দিক হইতে দেখিতে গেলে শিশুটি মরিয়া বাঁচিয়াছে। বড় হইলে পর কত সমস্যা আসিয়া দেখা দিত তার জীবনে—তার নিজের ও তার মায়ের জীবনকে দুর্ভর করিয়া তুলিত। কিন্তু এই প্রচণ্ড আঘাত হয়তো লিলির জীবনের আর একটা নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। পঙ্কজের চিন্তা আজ সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মন হইতে দূর করিতে পারিতেছে না। ছেলেটাকে শেষ পর্য্যন্ত সে সত্যই ভালবাসিয়াছিল।

মৃন্ময় স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। হোটেল ম্যানেজারকে জানাইয়া দিয়াছে যে, আজ আর তার আহারের প্রয়োজন নাই।

মৃন্ময় ভাবিতেছিল যে, ভাল আর সে কাহাকেও বাসিবে না। তার ভালবাসায় অভিশাপ আছে।

মৃন্ময় সহসা অতিমাত্রায় চমকাইয়া উঠিল। তার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মৃন্ময়ের সুখ-দুঃখের অনুভূতি, চিন্তাশক্তি সব যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, হঠাৎ বিকট অট্টহাস্যে

এই হোটেলের প্রকোষ্ঠখানাকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে, অথবা সম্মুখের ঐ বড় আয়নাটিকে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, অথবা মারাত্মক রকমের একটা কিছু করিয়া বসে, কিন্তু অতি কষ্টে সে তার অস্বাভাবিক মনোভাবকে দমন করিল। প্রকাশ্যে তার কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না। শুধু তাহাকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গম্ভীর মনে হইল।

মৃন্ময় এই মুহূর্ত্তে কি করিবে? কোন্‌টা কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টা অকর্ত্তব্য তার হিসাব নিকাশ করিবার সময় এবং মানসিক অবস্থা কোনোটাই এখন তার নাই—যাহা কিছুই করিতেছে তার মধ্যে কোন যুক্তিবিচারের প্রবণতা নাই। ধৈর্য্যের বাঁধন তার শিথিল হইয়া গিয়াছে, মন হইয়া পড়িয়াছে নিতান্ত দুর্ব্বল।

সে রাতটা মৃন্ময়ের যেন একটা অভিনব অনুভূতির ভিতর দিয়া আধ ঘুমে আধ জাগরণে কাটিয়া গেল। দিনের পরিপূর্ণ আলোকেও তার মনের আনাচে কানাচে, তার জাগ্রত চৈতন্যে শিশু পঙ্কজ যেন ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে প্রথম সে ঐ শিশুকে এতখানি ভালবাসিতে সুরু করিয়াছিল এ কথাটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কিন্তু এই অনুভূতির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র মিথ্যা অথবা কৃত্রিমতা নাই এ কথা একান্ত সত্য।

বেয়ারা অনেকক্ষণ চা দিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ মৃন্ময়ের সেদিকে হুঁস ছিল না। এতক্ষণে খেয়াল হইল, সে এক চুমুকে সবটুকু চা শেষ করিয়া কহিল, নিয়ে যাও আর কিছুর দরকার নেই। বেয়ারা একটু বিস্মিত ভাবে প্রস্থান করিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নান্টু আসিয়া তার ঘরে প্রবেশ করিল। মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, নান্টু নিজেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, ঘণ্টাখানেক আগে ফিরেছি, কিন্তু খবর পেয়ে আর একমুহূর্ত্ত দেরী করি নি।

নান্টু একটু দম লইয়া পুনরায় কহিল, এসে যখন পড়েছি তখন এখানে আর তোর থাকা হবে না। আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মৃন্ময় এতক্ষণে কতকটা আত্মস্থ হইয়াছে। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

নান্টু কহিল, আমাদের ওখানে। হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিতে গিয়ে জানলাম কোথাকার কোন রাজাবাবুর নির্দ্দেশে বিলটা তার কাছেই পাঠাতে হবে। কিন্তু জিনিষপত্র কোথায়।

মৃন্ময় আঙ্গুল দিয়া ঘরের কোণে একটি চামড়ার সুটকেস দেখাইয়া দিল।

নান্টু পঙ্কজের জন্য কেনা খেলনাগুলির প্রতি মৃন্ময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, ওগুলো ?

মৃন্ময়ের বুকের মাঝখানটা যেন ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল, চোখ দুটিও সজল হইয়া উঠিল। নান্টু পুনরায় প্রশ্ন করিতে মৃন্ময় জানাইল, ওগুলো আমার সম্পত্তি নয়। এখানেই থাকবে।

নান্টু কহিল, তা হলে মিথ্যে দেরী করে লাভ নেই। কাপড় জামা বদলে নে।

মৃন্ময় ক্লান্তির সুরে কহিল, তার দরকার হবে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নান্টু নিজেই সুটকেশটি বহিয়া লইয়া চলিল। মৃন্ময় একবার পিছন ফিরিয়া খেলনাগুলির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে নান্টুকে অনুসরণ করিল।

বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। নান্টু সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিল, মৃন্ময়কে কহিল, আয়। গাড়ী চলিতে লাগিল। মৃন্ময় অথবা নান্টু কেহই একটি কথাও কহিল না। উভয়ের মধ্যে যেন একটা অভ্রভেদী প্রাচীর দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া আছে। উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া

আছে। আজ কত বৎসর পরে তারা মিলিত হইয়াছে—কত কথা তাদের মনে জমা হইয়া আছে,অথচ এতটুকু আবেগ উচ্ছ্বাস কাহারও বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে না।

গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। নান্টু কহিল, ওঠ মিনু।

মৃন্ময় কলের পুতুলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বাহিরের ঘরে পা দিয়াই সে নান্টুকে প্রশ্ন করিল, খবরের কাগজে তোমার দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন দেখেই আমি ছুটে এসেছি নান্টুদা। কিন্তু কেন যে আমার খোঁজ করছ সে কথা তো এখনো আমায় বললে না।

নান্টু কয়েক মুহূর্ত মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ম্লান হাসিয়া কহিল, সে কথা এখুনি না বললে কি তুই ভিতরে আসবি নে?

মৃন্ময় একটু লজ্জিত হইল এবং আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কিন্তু মুখে কোন প্রশ্ন না করিলেও ভিতরের চাঞ্চল্য সে গোপন করিতে পারিতেছিল না। একটা অধীর আগ্রহ তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

নান্টু কহিল, হঠাৎ লীলার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়ে বোম্বাই চলে গিয়েছিলাম। তুই কত দিন কলকাতায় এসেছিস?

মৃন্ময় বলিল, প্রায় দশ বার দিন হবে।

নান্টু কহিল, গত পাঁচ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি—তোর নজরে পড়লো তা এতদিন পরে।

মৃন্ময় বলিল, এই কয় বছর খবরের কাগজের মুখ আমি এক রকম দেখিনি বললেই চলে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই একটায় আমার নজর পড়েছে। তারপরে আর দেরি করি নি। মোটামুটি ওদিককার একটা ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু কি তোমার প্রয়োজন নান্টুদা, যার

জন্যে আজ পাঁচ বছর ধরে আমার খোঁজ করে ধৈর্য্যের চরম পরীক্ষা দিচ্ছ।

নান্টু চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে হয়তো তার বক্তব্যটাকে গুছাইয়া লইতেছিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিল, চুপ করে আছ কেন নান্টুদা।

নান্টু সহসা সচেতন হইয়া উঠিল, না চুপ করে থাকব কেন? শুধু ভাবছিলাম কথাটা তোকে কি ভাবে বলা যায়। অথচ না বললেও আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হবে এবং নিজের কাছেও করতে হবে আজীবন জবাবদিহি।

মৃন্ময় অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি বলতে চাইছ কি নান্টুদা?

নান্টু কহিল, অন্যায় সব সময়েই অন্যায়—তা সে জেনে শুনেই করি, আর না জেনেই করি। নইলে এই পাঁচ বছর ধরে এই দুর্ব্বিষহ বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে কিসের জন্য। আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি মিনু।···

তোকে মিথ্যে বলছি না—নান্টু বলিয়া চলিল, আমার এ কথাটা সব সময় বিশ্বাস করিস যে, তোর উপর আমি যে অন্যায় করেছি তাতে বাস্তবিকই আমার কোন হাত ছিল না। আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তা ঘটেছে।

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। নান্টু ক্রমশই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে।

নান্টু বলিতে লাগিল, মঞ্জুর অনুরোধকে আমি অনুরাগ বলে ভুল করেছিলাম। তারই প্রায়শ্চিত্ত এখনও চলেছে।

নান্টুর দুই চোখ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া পরমুহূর্ত্তেই নিভিয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, মঞ্জুকে বরাবরই আমার ভাল লাগত। ছেলেবেলা থেকেই ওর প্রতি আমার একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু সেটাকে

অনুরাগই বলিস আর দুর্ব্বলতাই বলিস তার চরম দণ্ড পেলাম মঞ্জুকে বিয়ে করে।

মৃন্ময় সহসা অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া উঠিল। তার এতখানি আগ্রহ ও আশা লইয়া ছুটিয়া আসা যেন একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শূন্য দৃষ্টিতে সে নান্টুর পানে চাহিয়া আছে। নান্টুর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, সে আপন মনে বলিয়া চলিয়াছে, দশচক্রে ভগবানকে পর্য্যন্ত ভূত হতে হয়, আমরা তো সামান্য মানুষ। আমারও হয়েছিল সেই দশা। নইলে এতবড় দুর্ব্বুদ্ধি আমার হ'ত না। আর একটু হিসেব করে চোখ চেয়ে অগ্রসর হতাম। সাউথ ইণ্ডিয়ার বাস আমি তুলে দিলাম। দেহ মন আমার সুস্থ ছিল না। তার উপর লীলা আর এক কাণ্ড করে বসল। সে যোগ দিলে চিত্রজগতে। আমি বাধা দিতে সে হেসে বললে, তুমি আজও দেখছি এইটিন্থ সেঞ্চুরিতে রয়ে গেছ। উদ্বেগ বোধ করলাম। তার করে লীলার দাদাকে খবর পাঠালাম। সেখান থেকে বাধার পরিবর্ত্তে এল অকুণ্ঠ সম্মতি। ভেবে দেখলাম এদের এই দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই শেষ পর্য্যন্ত আমিই চলে এলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে চলে না এলেই বুঝি ভাল হ'ত। অন্তত এমনি ভাবে সর্ব্বক্ষণ নিজেকে অপরাধী মনে করতে হ'ত না। কত বড় ভুলই না আমি করলাম, ফলে না হলাম নিজে সুখী, না পারলাম অপরকে সুখী করতে। মাঝখান থেকে এক গুরু দায়িত্ব এসে কাঁধে চাপল।

মৃন্ময় স্থির হইয়া বসিয়া আছে। নান্টুর সব কথা তার কানে পৌঁছিতেছে কিনা তাহাও ওর মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সে যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। অতীতের বহু ঘটনা যেন তার চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

নাস্কু মৃন্ময়ের স্থির নির্ব্বাক মূর্ত্তির পানে খানিক একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিল, মঞ্জুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে। সে পূজো দিয়ে ফিরছিল। মঞ্জুই প্রথমে আমায় চিনতে পেরে আলাপ করে। নইলে আমার পক্ষে তা সম্ভব হ'ত না। মঞ্জু আগ্রহভরে আমায় তাদের বাড়ীতে থাকবার আমন্ত্রণ জানালে। সে আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। বিশেষ করে এত দীর্ঘকাল প্রবাস-বাসের ফলে মনটাও অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। তার পরের ঘটনাগুলো কতকটা নাটকীয় দ্রুত গতিতে শেষ হয়ে গেল। আমি নিজের সম্বন্ধে খুব বেশী ভেবে দেখবার অবকাশও পেলাম না। মঞ্জুষার একান্ত আগ্রহে আমি তাকে বিয়ে করতে সম্মত হলাম। মঞ্জু আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝতে দেয়নি যে, সে আমাকে আশ্রয় করে তোকে চরম দণ্ড দেবার ব্যবস্থা করেছে। বোকা মেয়েটা একবারও ভেবে দেখলে না যে, তারই দেওয়া আঘাত কত প্রচণ্ড হয়ে তাকেই আবার প্রত্যাঘাত করতে পারে। হ'লও তাই।...

নাস্কু একটু দম লইয়া পুনরায় বলিতে সুরু করিল, এত দুঃখের মধ্যেও এইটেই আমার মস্তবড় সান্ত্বনা যে, মঞ্জুষার চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ আমার দ্বারা হয় নি। একটা রাতের ব্যবধানেই চরম সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে রাধুর একখানা বিস্তারিত চিঠিতে। সেখানা পড়ে আমার সংসার-ধর্ম্মের স্বপ্ন এক নিমিষে টুটে গেল। ভাবলাম যা হ'ল তা বোধ হয় ভালই হ'ল। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বে অথবা অজ্ঞাতে আগুনে হাত দিলেও জ্বালা ভোগ করতে হবে বৈ কি। তাই আজও কাঁধের বোঝা নামিয়ে ফেলতে পারি নি। তার উপর সেই থেকেই মঞ্জুর বাবা যেন কেমন হয়ে গেছেন। এক রকম পাগলও বলা চলে।

মৃন্ময় ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্জ্জীব কণ্ঠে কহিল, কাকাবাবু পাগল হয়ে গেছেন!